স্মৃতির দর্পণে

পাঁচ মনীষী

হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রহ.

হযরত মাওলানা কারী সায়্যিদ মুহাম্মদ উসমান মানসুরপুরি রহ.

হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি রহ.

হযরত মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি রহ.

হযরত মাওলানা আবদুল খালেক সাম্ভলি

মূল

মাওলানা মুফতি আবুল কাসিম নোমানি দা.বা.

মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ, ইউ.পি.ভারত

অনুবাদ ও সংযোজন

মুফতি নাজমুল ইসলাম কাসিমী

দারুল উলুম দেওবন্দের সদ্য চলে যাওয়া
পাঁচজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

স্মৃতির দর্পণে

পাঁচ মনীষী

মূল

মাওলানা মুফতি আবুল কাসিম নোমানি

মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ, ইউ.পি.ভারত

অনুবাদ ও সংযোজন

মুফতি নাজমুল ইসলাম কাসিমী

সম্পাদনায়

জহির উদ্দিন বাবর

বার্তা সম্পাদক, ঢাকা টাইমস

সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী লেখক ফোরাম

দারুল উলুম লাইব্রেরী

[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ভেতরে যা আছে

প্রারম্ভিকা

শুরুর কথা

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা কারী সায়্যিদ উসমান মানসুরপুরি রাহিমাহুল্লাহ

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ

প্রারম্ভিকা

মৃত্যু মানুষের জীবনের এক অবধারিত পরিণতি। পৃথিবীর সবকিছু থেকে পলায়ন করা সম্ভব হলেও মৃত্যু থেকে পলায়ন করা সম্ভব নয়। এ কথা বিশ্বের সব দেশের, সব ভাষার এবং সব রকমের মানুষ বিশ্বাস করে। কারণ, এ পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়ায় এসেছে কেউ চিরদিন থাকতে পারেনি। সবাইকে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। এখন যারা বেঁচে আছেন তাদেরও একই পরিণতি ভোগ করতে হবে। মহাসত্য এই মৃত্যুর কথা আমরা কি স্মরণ করি? করলেও কতটুকু?

অথচ পবিত্র কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে–

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ﴾

'প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।'[১]

পবিত্র কুরআনে কারিমে আরও ইরশাদ হয়েছে–

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

'পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র আপনার রবের পবিত্র সত্তা অবশিষ্ট থাকবে।'[২]

---

১. সুরা আলে ইমরান: আয়াত ১৮৫

২. সুরা আর রহমান: আয়াত ২৬-২৭

আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ﴾

'তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদের পাকড়াও করবেই।'[৩]

কুরআনে কারিমের আরেক স্থানে উল্লেখ হয়েছে–

﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْمَوْتِ﴾

'তোমরা যে মৃত্যু থেকে পালাতে চাও, সে মৃত্যুর সঙ্গে অবশ্যই তোমাদের সাক্ষাৎ হবে। তারপর তোমাদের সেই মহান আল্লাহর কাছে ফেরত পাঠানো হবে যিনি প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সব বিষয় জানেন। এবং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল ও কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।'[৪]

বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসে প্রতিদিনই মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে। মৃত্যুর ভয় চেপে বসেছে মানুষের মন ও জীবনে। মৃত্যুর ভয় ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করছে অনেকেই। কিন্তু একজন বিশ্বাসী মানুষ মৃত্যুকে নয়, ভয় পায় মৃত্যু-পরবর্তী জীবন। প্রস্তুত থাকে সেই জীবনের জন্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলতেন–

'যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে তখন সকালের জন্য অপেক্ষা করো না, আর যখন তোমার সকাল হয় তখন সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করো না। অসুস্থ হওয়ার আগে তোমার সুস্থতাকে কাজে লাগাও আর তোমার মৃত্যুর জন্য জীবিতাবস্থায় পাথেয় জোগাড় করে নাও।'[৫]

---

৩. সুরা নিসা: আয়াত ৭৮

৪. সুরা জুমআ: আয়াত ৯

৫. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৬৪১৬

তবে ইসলাম মৃত্যু কামনাকে বৈধ মনে করে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'তোমাদের কেউ যেন কিছুতেই মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার আগে তার জন্য দোয়াও না করে। কেননা যখন তোমাদের কেউ মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর মুমিনের দীর্ঘ জীবন শুধু তার জন্য কল্যাণই বয়ে আনে।'[৬]

একইভাবে ইসলাম আত্মহত্যা নিষিদ্ধ করেছে। রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'যে পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে, চিরকাল সে জাহান্নামের ভেতর সেভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। যে বিষপানে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। যে লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনে সে লোহা তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে তা দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে।'[৭]

মৃত্যুর ভয় নয়, মৃত্যুর স্মরণ

ইসলাম মৃত্যুকে ভয় না করে, মৃত্যুর স্মরণ ও পরবর্তী জীবনের পরিণতি চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং সেসব মানুষের নিন্দা করেছে যারা মনে করে মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– 'তোমরা জীবনের স্বাদ ধ্বংসকারী (মৃত্যু)-কে বেশি পরিমাণে স্মরণ করো।'[৮]

মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

﴿وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾

'আমি তোমাদের যে জীবিকা দিয়েছি তা থেকে দান করবে তোমাদের কারও মৃত্যু আসার আগে। অন্যথায় মৃত্যু এলে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে দান করতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'[৯]

---

৬. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৯৯৫
৭. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৫৭৭৮
৮. সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২৩০৬
৯. সুরা মুনাফিকুন: আয়াত ১০

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে মুমিন

মৃত্যু যেমন অপরিহার্য, তেমন অনিশ্চিত তার সময়কাল। কেউ জানে না কখন তার মৃত্যু হবে। তাই মুমিন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে সব সময়। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾

'কেউ জানে না সে আগামীকাল কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না তার মৃত্যু কোথায় ঘটবে।'[১০]

আল্লামা ইবনে রজব রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষের প্রতিটি মুহূর্ত; প্রতিটি প্রাণীর প্রতিটি মুহূর্ত যেন তার মৃত্যুর মুহূর্ত। এজন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– 'হে তারিক! মৃত্যু আসার আগেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।'[১১]

মুমিনের মৃত্যুর প্রস্তুতি

এক আরব কবি বলেছেন, জীবন সে কয়েকটি চোখের পলকের নাম। অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালই জীবন। তাই সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে মুমিন মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– 'তোমরা পাঁচ জিনিসকে পাঁচ জিনিসের আগে গনিমত (সম্পদ) মনে করো–

১. *যৌবনকে বার্ধক্যের আগে;*

২. *সুস্থতাকে অসুস্থতার আগে;*

৩. *সচ্ছলতাকে অভাবের আগে;*

৪. *অবসরকে ব্যস্ততার আগে;*

৫. *জীবনকে মৃত্যু আসার আগে।*'[১২]

---

১০. সুরা লোকমান: আয়াত ৩৪
১১. আল-মুস্তাদরাক আলাস সাহিহাইন, হাদিস নং ৮৯৪৯
১২. মুস্তাদরাকে হাকিম, হাদিস নং ৭৮৪৬

ভালো কাজ করা

মৃত্যুর প্রধান প্রস্তুতি হলো নিজেকে ভালো কাজে নিয়োজিত করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– 'তোমরা নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতের অংশ সদৃশ ফেতনায় পতিত হওয়ার আগেই।'[১৩]

পাপ কাজ পরিহার

পাপ পরিহারের মাধ্যমে মুমিন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবধরনের পাপ নিষিদ্ধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾

'বলুন! আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ।'[১৪]

অতীত পাপের জন্য তাওবা

মুমিন অতীত ভুলত্রুটি ও পাপের জন্য তাওবা করার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। পবিত্র কুরআনে মৃত্যুর আগে তাওবা না করাকে 'জুলুম' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

﴿وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

'যারা তাওবা করে না, তারা অবিচারকারী।'[১৫]

এছাড়াও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাপা পড়ে, গর্তে পড়ে, পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে ও বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে মারা যাওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করতেন।[১৬]

আল্লাহ সবাইকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

---

১৩. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩২৮
১৪. সুরা আরাফ: আয়াত ৩৩
১৫. সুরা হুজুরাত: আয়াত ১১
১৬. সুনানে আবি দাউদ, হাদিস নং ১৫৫২

শুরুর কথা

২০১৭ সাল, তখন আমি দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্র। দাওরায়ে হাদিস পড়ি। দারুল উলুম দেওবন্দ যারা পড়তে যান; তাদের অধিকাংশেরই একটি স্বপ্ন থাকে– দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাণ; আমরা যাদেরকে আকাবির হিসেবেই চিনি; যাদের কিতাবাদির সাথে আমরা সেই ছোট থেকে পরিচিত; তাদের কাছে হাদিসের দরস গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করা। আলহামদুলিল্লাহ! মহান রাব্বে কারিমের অসংখ্য দয়া ও অনুগ্রহ; আমরা যখন দারুল উলুম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদিস পড়ি; তখন সেই মহারথি মুহাদ্দিসরাই আমাদের প্রতিটি কিতাবের দরসদানে ধন্য করেছেন। বছরের শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে সুন্দর মতোই চলছিল আমাদের প্রত্যেকটি দরস। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস; বছর শেষ হতে না হতেই হঠাৎ করেই দুজন মুরব্বি আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। একজন দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খে ছানী হিসেবে খ্যাত উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা শায়েখ আব্দুল হক আজমি রাহিমাহুল্লাহ। অপরজন হযরত মাওলানা রিয়াসত আলি বিজনৌরি রাহিমাহুল্লাহ। বলা যায়– এই দুজনের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই দারুল উলুম দেওবন্দের এই সময়ের মহারথি মুহাদ্দিস আকাবিরের ইন্তেকালের সিলসিলা শুরু হয়ে যায়।

আমার খুব মনে পড়ছে– হযরত মাওলানা শায়েখ আব্দুল হক আজমি রাহিমাহুল্লাহুর ইনতেকালের পর একদিন আমরা হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর একটি মজলিসে উপস্থিত হই। তিনি ওই মজলিসে দারুল উলুম দেওবন্দের আকাবিরের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে বললেন– আগামী বছর-তিনেকের মধ্যে দারুল উলুম দেওবন্দের আরও তিন থেকে চারজন মুরব্বির ইন্তেকাল হবে। তখন শুধু তাঁর কথাগুলো শুনেই যাচ্ছিলাম; অন্তরে তেমন একটা রেখাপাত করেনি। কিন্তু কে জানত; তাঁর সেই মুক্তাঝরা কথাগুলোই ছিল আমাদের জন্য আগাম সতর্কবাণী। আমার আরও স্মরণ হচ্ছে– ওই মজলিসে তিনি নিজের ব্যাপারে একটি কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন– আমি ইদানীং কোথাও সফরে যাই না; এর একটি মাত্রই কারণ; আমার ভয় হয়– যদি আমি এ দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়ে নিই তাহলে আমার চলমান তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআনের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আল্লাহর কী মহিমা! বছরও গড়ায়নি, এর মধ্যেই দারুল উলুম দেওবন্দের আরেকজন মুহাদ্দিস মাওলানা মুফতি জামিল আহমাদ সাহেব আমাদের থেকে চিরবিদায় নিলেন। এই তিনজন মহারথি মুহাদ্দিসের শোক তখনও দারুল উলুম কাটিয়ে উঠতে পারেনি, এর মধ্যে গোটা বিশ্বে শুরু হয় (এখনো চলছে) প্রাণঘাতী মহামারি করোনা ভাইরাসের প্রকোপ। গোটা পৃথিবী এই মহামারির আঘাতে নীরব ও স্থবির হয়ে আছে; কোথাও যেন একটুও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই; এরই মধ্যেই মুম্বাইয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে গোটা মুসলিম উম্মাহ শোকাহত হয়। কিন্তু শোকের গতিবেগ এখানেই থেমে থাকেনি। কোভিড-১৯ এর কারণে বছরখানেক থেকে দারুল উলুম দেওবন্দের দরস বন্ধ; এখনও দরস চালু হয়নি; এই অল্প সময়ের মধ্যেই একে একে আরও চারজন মহারথি মুহাদ্দিস ইহকাল ত্যাগ করেন। তারা হলেন– উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা ক্বারী সায়্যিদ মুহাম্মদ উসমান মানসুরপুরি রাহিমাহুল্লাহ; হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি রাহিমাহুল্লাহ; হযরত মাওলানা

নুর আলম খলিল আমিনি রাহিমাহুল্লাহ এবং মাওলানা আব্দুল খালেক সাম্ভলি রাহিমাহুল্লাহ। ইতঃপূর্বে সম্ভবত দারুল উলুম দেওবন্দ একসাথে এতোসংখ্যক মুরব্বির বিয়োগের শূন্যতা অনুভব করেনি এবং একাডেমিকভাবেও এতোটা সংকটের মুখোমুখি হয়নি। এতো এতো মুহাদ্দিস এবং তাদের শূন্যতা কখনও পূরণ হওয়ার নয়; তারপরও আমরা দোয়া করি, মহান রাব্বে কারিম যেন তাদের এ শূন্যতার উত্তম বদলা দান করেন।

আকাবিররা হলেন আমাদের জীবন পথের অন্যতম পাথেয়। তাদের জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে রয়েছে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা। আমাদের জীবনকে সফলভাবে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের স্বর্ণালী জীবন থেকে অনেক কিছুই সংগ্রহ করার প্রয়োজন রয়েছে। এই এক ঝাঁক মুহাদ্দিসের ইন্তেকালের পর তাদের সেই স্বর্ণালী জীবন নিয়ে তেমন কোনো কাজ এখনও হয়নি। সম্ভবত হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর জীবনীর ওপর কিছু কাজ হয়েছে। একদম না হওয়ার চেয়ে যা হয়েছে তাও আমাদের জন্য অনেক উপকারী। আলহামদুলিল্লাহ! সদ্য চলে যাওয়া এই চারজন মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ; হযরত মাওলানা কারী সায়্যিদ মুহাম্মদ উসমান মানসুরপুরি রাহিমাহুল্লাহ; হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি রাহিমাহুল্লাহ এবং হযরত মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে লিখনি এবং বয়ানের মাধ্যমে দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম, উস্তাদে মুহতারাম; হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসিম নোমানি (দা.বা.) বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্মৃতিচারণ করেছেন। ভারতের মাদরাসায়ে ইসলাহুল বানাত-এর শিক্ষাসচিব; মাওলানা ইরফান যমযম কাসিমি তাঁর সেই মহামূল্যবান স্মৃতিচারণগুলো বই আকারে বেশ সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করেছেন। সেই গ্রন্থের নাম দিয়েছেন- 'কুচ ইয়াদে কুচ বাতে'। বইটি কলেবরে যদিও বেশি বড় নয়, কিন্তু এর ভেতরের প্রতিটি কথা বেশ মূল্যবান। একজন সহকর্মী ও মুহতামিম তাঁর সহকর্মীদের ব্যাপারে স্মৃতিচারণ করেছেন; সেটা অবশ্যই আমাদের জানা প্রয়োজন।

আমি যখন এই উর্দু গ্রন্থটি পড়েছি তখন মনে হয়েছে– গ্রন্থটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য অনুবাদ করা দরকার। সেই চিন্তা থেকেই দারুল উলূম লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় মাওলানা শহীদুল ইসলাম ভাইয়ের সাথে আলোচনা করি। তিনি বইটি অনুবাদ করার পাশাপাশি সদ্য মারা যাওয়া এই চারজন মুহাদ্দিসের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযুক্ত করে একটি বই করার পরামর্শ দেন।

অধম মাসখানেক চেষ্টা করে এবং নিজের সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে সংক্ষিপ্ত হলেও তাদের জীবনী সংযোজন করে বইটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। যদিও তাদের পরিপূর্ণ স্বর্ণালী জীবন জানার জন্য এই বইটি কখনও যথেষ্ট না; এটাকে কেবল তাদের সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা নেওয়ার ক্রোড়পত্র হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। আমি জানি– তাদের সম্পর্কে আগামীতে বিশাল কলেবরে অনেক গ্রন্থ রচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই বইটি যেহেতু খুবই অল্প সময় নিয়ে করা; সেই হিসেবে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত চাওয়া কতটুকু পূরণ হবে তা তো জানি না। তবে আশা রাখি– এই বইটি পড়লে তাদের সম্পর্কে বিস্তরভাবে জানার প্রবল আগ্রহ তৈরি হবে।

বইটি কাজ করতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেকের থেকে বেশ উপকৃত হয়েছি; কয়েকজন বন্ধুপ্রতিম লেখকের লিখনি থেকে অনেক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। আল্লাহ তায়ালা তাদের ইলমে আরও বারাকাহ দান করুন।

এছাড়া বইটির কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে যে মানুষটির মিষ্ট বিড়ম্বনা ও সহযোগিতা আমার কাজে গতি সঞ্চার করেছে–আমার জীবনসঙ্গীনী প্রিয়তমা নুর আজিজার প্রতি আমার ঢের ভালোবাসা, আল্লাহ তায়ালা উভয় জীবনে তার মাধ্যমে আমার চক্ষুকে শীতল রাখুন। পাশাপাশি– এই বইয়ের প্রথম পাঠক; স্নেহের ছোট বোন, নওশিন ও সারা-কে আল্লাহ কুরআনের হাফেজা হিসেবে কবুল করুন।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি– শ্রদ্ধেয় মাওলানা শহীদুল ইসলাম ভাইয়ের; যার স্নেহ ও ভালোবাসায় মহান আল্লাহ পাক অধমকে কিছু কাজ করার সুযোগ করে দিচ্ছেন; আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

বইটি সম্পাদনা করে দিয়ে কৃতজ্ঞতার ডোরে আবদ্ধ করেছেন শ্রদ্ধেয় জহির উদ্দিন বাবার।

বইটি পাঠ করার পর সচেতন পাঠকের চোখে ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হওয়া স্বাভাবিক। আশা রাখবো– কোনো ভুলত্রুটি পেলে আমাদের জানাবেন; আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করে পরবর্তী সংস্করণে সেটাকে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।

সবশেষ মহান রাব্বে কারিমের দরবারে আর্জি পেশ করছি- তিনি যেন এই বইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করেন এবং এই দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেওয়া আমাদের আকাবির হযরতদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দেন। আমিন।

– নাজমুল ইসলাম কাসিমী

দারুল উলুম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসিন ও শায়খুল হাদিস

বহু গ্রন্থ প্রণেতা, সাঈদে মিল্লাত, হযরত মাওলানা

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ

স্মৃতিচারণে

মাওলানা মুফতি আবুল কাসিম নোমানি

মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ, ইউ.পি. ভারত

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد:

অসুস্থতার শুরু যেভাবে

তখন সাহরি খাচ্ছিলাম। হঠাৎ এমন একটি সংবাদ এলো, যাতে অনেকটা থমকে গেলাম। তখন কিছুই যেন বলতে পারছিলাম না। একজন এসে সংবাদ দিলো, দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাক্তন উস্তাদ হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি ইন্তেকাল করেছেন। মূল ঘটনা ছিল– রজব মাস থেকেই মুফতি সাহেবের একটি সমস্যা প্রকটভাবে দেখা যাচ্ছিল। প্রায় সময়ই হঠাৎ করে তাঁর আওয়াজ বন্ধ হয়ে যেতো। বারবার কথা বলতে চাইতেন, কিন্তু কোনো কথা মুখ দিয়ে বের করতে পারতেন না। অনেক কষ্ট করে বুখারি শরিফের শেষ সবক পর্যন্ত তাঁকে দরস দিতে হয়েছে। তাঁর এই সমস্যাটি ছাত্ররা রেকর্ড করেছিল এবং তা সবার কাছে ভাইরালও হয়েছিল। যাই হোক– সবক শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই মুফতি সাহেব তাঁর ছেলেকে সঙ্গে করে চিকিৎসার জন্য মুম্বাই চলে যান। ইতঃপূর্বেও মুম্বাইয়ে তাঁর অপারেশন হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ! অপারেশন সাকসেসফুলও হয়েছিল। এছাড়াও ইতঃপূর্বে বেশ কয়েকবার চেকআপ করার জন্য মুম্বাইয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর এক মেয়েও সেখানে থাকেন।

ইন্তেকাল

চিকিৎসার জন্য মুফতি সাহেব মুম্বাইতে পৌঁছলেন। এদিকে কিছুদিনের মধ্যেই দেশে করোনাভাইরাসের কারণে লকডাউন দিয়ে দেওয়া হলো। ফলে মুফতি সাহেব আর দেওবন্দ ফিরে আসতে পারলেন না। তবে সেই সময়ও তাঁর বয়ানের ধারাবাহিকতা চালু ছিল। বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ের ওপর অনেক মজলিসেও যোগ দিয়েছেন তিনি। যে অসুস্থতার কারণে তিনি মুম্বাই গিয়েছিলেন, সেটাও আলহামদুলিল্লাহ আরোগ্য হয়েছে। এছাড়া অন্য কোনো অসুস্থতার লক্ষ্মণও তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না। কথা বলতে যে সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছিল তাও আলহামদুলিল্লাহ পুরোপুরিভাবে ঠিক হয়ে গিয়েছে।

এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর হঠাৎ তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলো এবং দু-একদিনের মধ্যেই তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন হতে লাগল। খুব দ্রুত শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে দেখা গেল। মাত্র একদিন আগে তাঁর ছেলে আমাকে ফোন দিয়ে বললেন– আব্বুর অবস্থা খুব একটা ভালো না; তারপর সাহরির সময় আবার তার সাথে কথা হলো, বললেন– এখন কিছুটা ভালোর দিকে। অনেকটা শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছেন। আবার কিছুক্ষণ পর তার ফোন এলো। তখন শুনলাম, তিনি আর এই দুনিয়াতে নেই। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)

তাঁর শিক্ষকতার সময়কাল

হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি দারুল উলুম দেওবন্দের বিশিষ্ট উস্তাদ ছিলেন। ১৩৯৩, ১৩৯৪, ১৩৯৫ হিজরি হলো তাঁর শিক্ষকতা শুরুর জীবন। যদি এভাবে হিসাব করা হয়; তাহলে দেখা যাবে– তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে একাধারে ৪৮ বছর শিক্ষকতা করেছেন। তিনি একদম প্রাইমারি লেভেল থেকে শিক্ষকতা করে পর্যায়ক্রমে দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল হাদিস এবং সদরুল মুদাররিসিন হয়েছেন। তাঁর এই দীর্ঘকালের পাঠদানের পদ্ধতি ছিল অন্যদের থেকে একটু ভিন্ন। সাধারণভাবে অন্যান্য শিক্ষকদের হাদিসের কিতাবগুলো বিশেষত বুখারি শরিফ পাঠদানের পদ্ধতি হলো– বছরের প্রাথমিক (৩/৪ মাসের) দরসগুলোতে সবিস্তার আলোচনা করেন। আর বছরের শেষ পর্যায়ে চলে এলে কেবল আরবি ইবারত পাঠদান করান।

তাঁর পাঠদান পদ্ধতি

মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি সাহেবের সারা বছরের পাঠদান পদ্ধতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তিনি সারা বছর প্রতিটি কিতাবেই ছাত্রদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার সাথে একই পদ্ধতিতে পাঠদান করতেন। তিনি বেশ কিছু কিতাব রচনা করেছেন। তাঁর বুখারি শরিফের পাঠদানের সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। তিরমিজি শরিফের পাঠদানের সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। একইভাবে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'রাহমাতুল্লাহিল ওয়াসিআহ'ও তিনি লিখেছেন। এরপর আলহামদুলিল্লাহ! মহাগ্রন্থ আল কুরআনের তাফসির 'তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন'-এর কাজও সম্পন্ন করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর অনেক কিতাবাদি রচনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত রচনার সংখ্যা অনেক।

কিছু বৈশিষ্ট্যাবলি

হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। যে কারও সাথে কথা বললেই তাঁর এসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ ফুটে উঠত। তাঁর মাঝে যে এসব বৈশিষ্ট্য ও গুনাগুণ রয়েছে সেটা সহজেই উপলব্ধি করা যেত। তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য তো সবার কাছে স্বতঃসিদ্ধ– তিনি সময়ের অনেক মূল্যায়ন করতেন। যেকোনো সময় যে কাউকে নিয়ে কোনো গল্পের আসর বসাতেন না। তাঁর উসুল ছিল– তিনি কেবল আসরের নামাজের পর নির্দিষ্ট কিছু সময় ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ রাখতেন। এই সময়ের মধ্যে সাধারণত যে কেউ তাঁর মজলিসে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পেত। এছাড়া বাকি সময়গুলো তিনি তাঁর লেখালেখি, অধ্যায়ন এবং গবেষণায় কাটাতেন। তাঁর আরও একটি সাধারণ অভ্যাস ছিল– তিনি এক কাজ থেকে অবসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনো কাজ শুরু করে দিতেন।

অভিমত প্রদানে পরিপক্কতা

এমনিভাবে যেকোনো বিষয়ে তিনি যে অভিমত দিতেন তাতে ভরপুর পরিপক্কতা দেখা যেতো। এ ব্যাপারে তিনি সর্বমহলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি যে মতামত পেশ করতেন সেই মতামতের ওপর খুবই শক্তভাবে

অটল এবং অবিচল থাকতেন। অনেক সময় এমন হতো তাঁর মতামতের ওপর অনেকেই একমত পোষণ করতেন না। কিন্তু এটা ভালো একটি গুণ যে– অনেক চিন্তা-ভাবনা করে যেকোনো বিষয়ের ওপর নিজস্ব মতামত প্রদান করতেন এবং এর ওপর শেষ পর্যন্ত অটল-অবিচল থাকতেন।

মুফতি সাহেবের ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি, ফতোয়া, হাদিস, তাফসির এছাড়াও উলুমে আকলিয়ার ওপর ইলমি অনেক গভীরতা ছিল। তিনি তাঁর সন্তান-সন্ততিদের পড়ানোর জন্য 'মাবাদিউল ফালসাফাহ' নামে রিসালাও লিখেছেন। দর্শন সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনে সমকালীন শিশুদের জন্য এটি একটি যুগোপযোগী রচনা।

মুফতি সাহেবের সাথে আমার পরিচয় ও সম্পর্ক

হযরত মুফতি সাহেবের সাথে আমার পরিচয় সেই ছাত্রজীবন থেকে। আমি যখন দারুল উলুম দেওবন্দে (১৯৬২ ঈসায়ি/শাওয়াল, ১৩৮২ হিজরি) ভর্তি হওয়ার জন্য আসি; সে বছর ছিল মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেবের শিক্ষা সমাপনী বর্ষ। পরবর্তী বছর আমার রুম ছিল (রুম নং-৪) যেটাকে বর্তমানে সবাই ২৪নং রুম হিসেবে চিনে। বর্তমানে এই রুমের নিচে যে রুম রয়েছে; যা 'শুবায়ে সাফাই' হিসেবে প্রসিদ্ধ; ওই রুমে মুফতি সাঈদ আহমাদ সাহেব থাকতেন। আর সেটা ছিল তাঁর দারুল ইফতার বছর। এটি সম্ভবত ১৩৮৩/১৩৮৪ হিজরির কথা।

ব্যস্ততা ও কাজে মনোযোগিতা

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি সাহেব বেশ মনোযোগিতার সঙ্গে নিজস্ব পড়াশোনা ও ইলমি কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি ইশার পর থেকে শুরু করে রাত ১২/১টা পর্যন্ত কুরআন শরিফ মুখস্থ করার জন্য পড়ার টেবিলে বসে যেতেন। আমার যতটুকু মনে পড়ে– এভাবেই তিনি একা একা কুরআন শরিফ পুরোটা মুখস্থ করেন।

তখনকার সময় তাঁর একজন ছোটভাই মুফতি আমিন সাহেবও তাঁর সাথে ছিলেন। খুবই মনোযোগের সাথে তিনি পড়ালেখায় ব্যস্ত থাকতেন। মূল্যবান সময় কখনও তিনি অনর্থক কোনো কাজে ব্যয় করতেন না। নিজস্ব মুতালাআ, মুজাকারা এবং দরসের প্রতি অনেক

পাবন্দি করতেন। এজন্যই তখন থেকে তিনি সব উস্তাদের কাছে অনেক গ্রহণযোগ্য ও স্নেহের পাত্র হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেন।

আমার খুব মনে পড়ছে– কুরবানির ঈদের সময় একবার তাঁর সাথে ইহাতায়ে মুলসুরিতে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি দারে জাদিদের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি কাছাকাছি দাঁড়িয়ে শুনছিলাম, তিনি যাচ্ছিলেন আর একা একা বলছিলেন– খুব মন চাচ্ছে আজ দারে জাদিদকে একবার দেখব; কয়েক মাস গত হয়ে গেল, দারে জাদিদের ভবনগুলো দেখি না।

দারুল উলুম দেওবন্দের ভেতর মাত্র একটি ভবন নওদারা ও দারুল হাদিস (লাল বিল্ডিং); যেটার অবস্থান সদর দরজার কাছাকাছি। দরস করতে তিনি কেবল দারুল ইফতাতে যেতেন, যেটা মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। এছাড়া নামাজ পড়তেন মসজিদে কাদিমে। দারুল উলুমের বোর্ডিংও এই এরিয়াতে ছিল। এজন্য দারে জাদিদের ওদিকে যাওয়ার তাঁর কোনো প্রয়োজনই দেখা দিতো না। এ কারণেই মূলত তিনি দীর্ঘ সময় পর অনেক আগ্রহ নিয়ে দারে জাদিদ দেখতে যাচ্ছিলেন।

বুখারি শরিফ পাঠদান

হযরত মুফতি সাহেবের সাথে আমার প্রাথমিক পরিচয় কীভাবে হয়েছিল সেটা আগেই বলেছি। এরপর থেকেই তিনি যখন যেখানেই ছিলেন তাঁর সাথে আমার সবসময় যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। অবশেষে ১৩৯৫ হিজরিতে যখন দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ হলেন; তখন তাঁর কাছে আমার আসা-যাওয়া আরও বেড়ে যায়। অন্যান্য উস্তাদের সাথেও আমার মোলাকাত হতো। আর এভাবেই তাঁর সাথে আমার ভালোবাসা ও হৃদ্যতা বাড়তে থাকে। আজ থেকে প্রায় ১২ বছর আগে হযরত মাওলানা নাসির আহমাদ খান সাহেব যখন নিজের বার্ধক্যের কারণে বুখারি শরিফ পড়ানোর ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন; তখন তৎকালীন বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ মুহতামিম হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান সাহেব বুখারি শরিফের পাঠদানের দায়িত্ব হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি সাহেবকে প্রদান করেন।

আমার সৌভাগ্য, আমি ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। হযরত মুহতামিম সাহেব পরামর্শ করার জন্য আমাকে বানারস থেকে এবং হযরত মাওলানা মুফতি মনযুর আহমাদ সাহেবকে কানপুর থেকে খবর দিয়ে নিয়ে আসেন। হযরত মুফতি সাহেব তখনও দিল্লি পর্যন্ত এসেছেন, দেওবন্দ পৌছাননি; আর ঠিক তখন দেওবন্দে হযরত মুহতামিম সাহেবের খেদমতে উপস্থিত। আমার সামনেই তিনি হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি সাহেবকে ডাকলেন এবং বললেন– বার্ধক্যজনিত কারণে হযরত মাওলানা নাসির উদ্দিন খান সাহেব বুখারি শরিফ পাঠদানের ব্যাপারে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন; আপনাকে বুখারি শরিফের সবক পড়াতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী মজলিসে শুরার মিটিংয়েও সেটার প্রস্তাব উঠিয়ে তা চূড়ান্ত করা হয়। তখন থেকেই হযরত মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি দারুল উলুমের সদরুল মুদাররিসিনও ছিলেন। এটাই ছিল তাঁর একটি সাংবিধানিক পদবি। মুফতি সাহেবের পুরোটা সময়জুড়ে একমাত্র ব্যস্ততাই ছিল– লেখালেখি গবেষণা এবং রচনা ও কিতাব অধ্যয়ন। দরস চলাকালে তিনি কখনও বাইরে সফরে যেতেন না। যখন তাঁর সব কিতাবাদি পাঠদান শেষ হয়ে যেতো তখন তিনি সফরে বের হয়ে যেতেন। সাধারণত তিনি আমেরিকা-ইউরোপের কোনো দেশে ইলমি সফরে পুরো রমজান মাস কাটাতেন। সেখানেই প্রত্যহ নিয়মতান্ত্রিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বয়ান করতেন; অসংখ্য-অগণিত মানুষ তাঁর বয়ান থেকে উপকৃত হতো। এমনিভাবে কুরবানির ঈদের ছুটিতেও প্রয়োজনীয় কোনো প্রোগ্রাম থাকলে সফরে বের হতেন অন্যথায় দারুল উলুমের দরস চলার সময়ে কখনও বাইরে সফরে বের হতেন না। এই সময়ে সফর করা বিলকুল তাঁর মেজাজবিরোধী ছিল।

দারুল উলুম একজন মহান ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত

আজ যখন তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে, নিজের মাঝে অনেক নিঃসঙ্গতা অনুভব হচ্ছে। দারুল উলুম দেওবন্দ বিগত দুই তিন বছর থেকে অনেক মহারথিকে হারিয়ে বেশ সংকটের মুখোমুখি। আমাদের থেকে একে একে অনেকেই চলে গিয়েছেন; মাওলানা আব্দুর রহিম বাস্তাবির ইন্তেকাল হয়েছে; তারপর মাওলানা রিয়াসত আলি বিজনুরি রাহিমাহুল্লাহ; তারপর মাওলানা আব্দুল হক সাহেব (শায়খে ছানি)

রাহিমাহুল্লাহ; তারপর মাওলানা জামাল আহমাদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ; তারপর মাওলানা জামিল সাহেব সাখরাবি রাহিমাহুল্লাহ; আর এখন মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ইনশাআল্লাহ! তাঁদের ব্যাপারে অনেক আলোচনা হবে; অনেক কিতাবাদি রচনা হবে; উম্মাহ এসব থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে। আমি একজন নগণ্য মানুষ, আপনাদের সামনে তাদের সম্পর্কে অল্প কিছু কথা বললাম। বড়রা চলে যান। আর ছোটরা তাদের পেছনে থেকেই যান। তবে বড়রা চলে যাওয়ার পর ছোটদের ওপর অনেক ভারী ভারী দায়িত্ব চলে আসে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিবেদন

আমাদের মাঝে একটি ব্যাপার খুবই প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে– আমরা যেকোনো সময় যে কারও সম্পর্কে জেনে না জেনে অথবা নিজের ধারণা অনুযায়ী যেকোনো মন্তব্য করে বসি। আমি এই কথাটি বিশেষত আলেমদের উদ্দেশ্য করে বলছি– এই মহাব্যাধিতে আমরাও এখন আক্রান্ত। যা শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ নাজায়েজ। এজন্য সবসময় আমরা আল্লাহর কাছে এই দোয়া করি– যদি নিজের অজান্তে কারও সম্পর্কে আমাদের থেকে এরকম কোনো ভুল সংঘটিত হয়ে যায়; মহান আল্লাহ যেন আমাদের এই ভুল-ভ্রান্তিগুলো ক্ষমা করেন। তাদের ওপর আল্লাহ যেন সবসময় খুশি থাকেন। আমরা সবসময় তাদের জন্য মাগফেরাত এবং নাজাতের দোয়া করব; সঙ্গে সঙ্গে এই দোয়াও করব– আল্লাহ যেন কেয়ামত অবধি দারুল উলুম দেওবন্দকে হেফাজত করেন। মুফতি সাহেবের ইন্তেকালের কারণে দারুল উলুম দেওবন্দে যে শূন্যতা বিরাজ করছে এর যেন যথাযথ বদলা দান করেন। যাতে দারুল উলুমের পাঠদান পদ্ধতিতে কোনো ধরনের অসম্পূর্ণতা না থাকে। আমরা যারা তাদের পেছনে রয়ে গিয়েছি, আমাদের চলে যাওয়ার সময়ও একদম নিকটবর্তী! বয়সের দিক থেকে আমরাও তাদের অনেকটা কাছাকাছি। অনেকেরই বয়স সত্তরের ঊর্ধ্বে। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকেও উত্তম মৃত্যু দান করেন। যতদিন দারুল উলুম দেওবন্দের খেদমত করবো, যেন একনিষ্ঠতার সঙ্গে করার তাওফিক দেন। আমিন।

সদরে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, দারুল উলুম দেওবন্দের নির্বাহী

মুহতামিম

হযরত মাওলানা কারী সায়্যিদ মুহাম্মদ

উসমান মানসুরপুরি রাহিমাহুল্লাহ

স্মৃতিচারণে

মাওলানা মুফতি আবুল কাসিম নোমানি

মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ, ইউ.পি. ভারত

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ﴾ ﴿الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ﴾ ﴿اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ﴾

'এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল, জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত।[১৭]

উপস্থিত দীনি ভাই ও বন্ধুগণ! আমি এখন কী বলতে চাচ্ছি– আপনারা অবশ্যই সে সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত রয়েছেন। আমাদের সবার বুজুর্গ এবং অভিভাবক; মাওলানা সায়্যিদ কারী মুহাম্মদ উসমান মানসুরপুরি (সদরে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এবং নির্বাহী মুহতামিম,

---

১৭. সুরা বাকারা: আয়াত ১৫৫-১৫৭

দারুল উলুম দেওবন্দ) আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে অনন্তকালের পথে যাত্রা করেছেন। হযরত মাসখানেক ধরে প্রচণ্ড অসুস্থতায় ভুগছিলেন; কখনও কখনও কিছুটা সুস্থতা দেখা গেলেও পরিপূর্ণভাবে সুস্থতা লাভ করেননি। অনেক সময় শুনতাম কিছুটা সুস্থ হয়েছেন, আবার কখনও শুনতাম তাঁর অসুস্থতার মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছে। আর এই অবস্থাতেই তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মেদান্তা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর তাঁর কোভিড-১৯ এর রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। কিন্তু তখনও তাঁর অসুস্থতার তীব্রতায় তিনি বেশ কষ্ট পাচ্ছিলেন। ফলে তাঁর সার্বিক দিক বিবেচনা করে দায়িত্বরত ডাক্তাররা তাঁকে ভেন্টিলেটরে রাখার পরামর্শ দেন। মাওলানা সায়্যিদ মাহমুদ মাদানি দিল্লি থেকে আসেন; অপরদিকে তাঁর দুই সন্তান মুফতি সায়্যিদ মুহাম্মদ সালমান মানসুরপুরি এবং মুফতি সায়্যিদ মুহাম্মাদ আফফান মানসুরপুরিও হসপিটালে পৌছান। সবার উপস্থিতি ও পরামর্শে জরুরি ভিত্তিতে তাঁকে ভেন্টিলেটারে স্থানান্তরিত করা হলো। কিন্তু তারপরও তাঁর মাঝে সুস্থতার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সকালে আবার সবার পারস্পরিক পরামর্শ হলো এবং সিদ্ধান্ত হলো- যেহেতু এখানে তাঁকে ওষুধ ছাড়া চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে সুতরাং তাঁকে এখান থেকে ডিসচার্জ করে দেওবন্দে নিয়ে যাওয়াই ভালো এবং সেখানেই তাঁর চিকিৎসা করানো হোক। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার পূর্বেই দুপুর একটার দিকে কারী সাহেব ইন্তেকাল করেন। অথচ এখনও অনেক মসজিদে তাঁর সুস্থতার জন্য দোয়া করা হচ্ছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি, এর আগেই তিনি মহান রবের সান্নিধ্যে চলে গেলেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)।

হযরত কারী সাহেবের বৈশিষ্ট্যাবলী

এদিকে মুসলিম উম্মাহর অতন্দ্র প্রহরী উলামায়ে কেরাম, অনেক শায়েখ-মাশায়েখ এবং দারুল উলুম দেওবন্দের উস্তাদবৃন্দ ও আমাদের অভিভাবকরা একে একে ইন্তেকাল করে চলে যাচ্ছেন, যা পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক শঙ্কার কারণ। যারাই ইতঃপূর্বে আমাদের থেকে গত হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের মাঝেই কোনো না কোনো ভালো গুণ

এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হযরত কারী সাহেবও তেমনি এক মহারথী ছিলেন। তাঁর মধ্যে এতো পরিমাণ ভালো গুণ রয়েছে যে, আমি তাঁর মতো একজন মহান ব্যক্তি জীবনে খুব কমই দেখেছি। যুগের চাহিদা ও পরিস্থিতি প্রেক্ষাপটে তিনি সত্যিকারার্থে একজন আমিরুল হিন্দ ছিলেন। ইমারতে শরঈয়্যাহ হিন্দ[১৮]-এর প্রধান ছিলেন। সংগঠনটির নাজিম ইন্তেকাল করার পর হযরত কারী সাহেব ইমারতে শরঈয়্যাহ হিন্দ নিয়ে অনেক ব্যস্ত সময় পার করছিলেন। তাঁর জায়গায় সুযোগ্য কাউকে

---

১৮. জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ইমারাতে শারইয়্যাহ হিন্দ এর পঞ্চম আমিরুল হিন্দ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন দারুল উলুম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসিন উস্তাদে মুহতারাম হজরত মাওলানা সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানি হাফিজাহুল্লাহ। ৩রা জুলাই ২০২১ সকালে নয়া দিল্লির আইটিওতে অবস্থিত জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের অফিসে মাদানি হলে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি নায়েবে আমিরুল মুমিনিন হিসেবে নির্বাচিত হন হযরত মাওলানা মুফতি সাইয়্যিদ মুহাম্মদ সালমান মানসুরপুরি হাফিজাহুল্লাহ।

প্রসঙ্গত, ১৯ শে নভেম্বর ১৯১৯ প্রতিষ্ঠিত জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই উম্মতে মুসলিমাহ হিন্দের ধর্মীয় সামগ্রিক বিষয়াদির সমাধান ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার লক্ষ্যে একজন আমিরুল হিন্দ নির্বাচন করার প্রয়োজন অনুভব করে। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে রেশমি রুমাল আন্দোলনের মহানায়ক শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রাহিমাহুল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু তখন পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক না থাকায় সামগ্রিকভাবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলেও প্রাদেশিক পর্যায়ে বিহার রাজ্যে এর বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠলে তা কার্যকর করা হয়। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য আমিরুল হিন্দ নির্বাচন করার চেষ্টা অব্যাহত থাকে।

পরিশেষে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে সমগ্র ভারতবর্ষে ইমারাতে শারইয়্যাহ হিন্দ এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দিল্লিতে একটি বৃহত্তর প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ইমারাতে শারইয়্যাহর মিশন বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্মেলনে সর্বপ্রথম আমিরুল হিন্দ হিসেবে মুহাদ্দিসে কাবির হিসেবে খ্যাত আবুল মাআসির হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি রাহিমাহুল্লাহ নির্বাচিত হন।

১৯৯২ সালে হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি রাহিমাহুল্লাহর ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় আমিরুল হিন্দ হিসেবে নির্বাচিত হন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের তখনকার সভাপতি ফিদায়ে মিল্লাত, হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আসআদ মাদানি রাহিমাহুল্লাহ ।

তাঁর ইন্তেকালের পর ২০০৬ সালে তৃতীয় আমিরুল হিন্দ হিসেবে নির্বাচিত হন দারুল উলুম দেওবন্দের দীর্ঘ ২৮ বছরের সফল মুহতামিম হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান বিজনুরি রাহিমাহুল্লাহ।

তাঁর ইন্তেকালের পর ২০১১ সালে চতুর্থ আমিরুল হিন্দ হিসেবে নির্বাচিত হন হযরত মাওলানা কারী উসমান মানসুরপুরি রাহিমাহুমুল্লাহ।

তাঁর ইন্তেকালের পর অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি সম্মেলনে পঞ্চম আমিরুল হিন্দ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আরশাদ মাদানি হাফিজাহুল্লাহ। আর তাঁর সহযোগী হিসেবে কাজ করবেন মুফতি সালমান মানসুরপুরি হাফিজাহুল্লাহ।

নবনির্বাচিত আমিরুল হিন্দ জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, ইমারাতে শারইয়্যাহসহ সর্বভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় সব সংগঠনের সুন্দর তদারকি করবেন–এটাই প্রত্যাশা সবার।

বসানোর জন্য হযরত কারী সাহেব প্রাণপণ চেষ্টা করে গিয়েছেন। বারবার ফুজালাদের একত্রিত করেছেন, তাদের সাথে কথা বলেছেন, তাদের ইন্টারভিউ নিয়েছেন, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে সাময়িক কাজের জন্য ভারপ্রাপ্ত হিসেবে তাঁর জায়গায় মাওলানা আব্দুল মালিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু কে জানত স্থায়ী কোনো নাজিম নির্বাচন করার আগেই স্বয়ং আমিরুল হিন্দ ইহকাল ত্যাগ করে চলে যাবেন! সবই মহান রাব্বে কারিমের একান্ত ইচ্ছা।

হযরত কারী সাহেবের জীবনের নানা কর্মব্যস্ততা

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের যে কঠিন সময়ে তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বিচক্ষণতার সাথে এই দলটিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সংগঠনের প্রত্যেকটি কর্মী এই বিষয়ে পূর্ণ অবগত। হযরত কারী সাহেব ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের মাকবুল এবং গ্রহণযোগ্য উস্তাদদের একজন। ১৯৮২ সালে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ হন। উল্লেখ্য, তিনি ১৯৬৫ সালে দারুল উলুম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। আমিও ১৯৬২ সালে দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হই। আমার ভর্তি হওয়ার তৃতীয় বছরে হযরত দাওরায়ে হাদিস পড়েন। হযরত কারী সাহেব ছিলেন আমাদের বানারসের মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস সাহেবের সহপাঠী। দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করার পর হযরত কারী সাহেব সর্বপ্রথম হযরত মাওলানা কারী ওয়াকফুদ্দীন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা জামিয়া কাসিমিয়াতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। মাওলানা কারী ওয়াকফুদ্দীন ছিলেন হযরত মাদানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্যতম খলিফা। হযরত কারী সাহেব সেখানে একাধারে পাঁচ বছর শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি সেখান থেকে জামিয়া আমরুহাতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ হন। এখানে তিনি একাধারে ১১ বছর সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেন। তারপর তিনি সেখান থেকে দারুল উলুম দেওবন্দ আসেন; আর তখনই হযরত কারী সাহেবের যোগ্যতা ও নাম-দাম সবার কাছে ব্যাপক পরিচিতি পায়।

হযরত কারী সাহেব সবার কাছে প্রশংসনীয় সৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিনয়ী, গাম্ভীর্য এবং ছাত্রদের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। ক্লাসের ভিন্নতার কারণে যদিও আমার এবং তাঁর মাঝে অনেকটা দূরত্ব ছিল, কিন্তু আমাদের উস্তাদ হযরত মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানভি রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রতিষ্ঠিত 'আন-নাদি আল আদাবি'-এর সুবাদে বিভিন্ন বিভাগ এবং ক্লাসের ছাত্ররা একই প্লাটফর্মে কাজ করতো। আমিও এই সংগঠনে ছিলাম। এই সংগঠনের দায়িত্বগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল; এটার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য হযরত কারী সাহেব অনেক নতুনত্ব নিয়ে আসছিলেন। এটার একটি বিভাগ ছিল 'কাজা' নামে। এই বিভাগের কাজ ছিল এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছাত্রদের মধ্যকার কোনো বাকবিতণ্ডা, ঝগড়া-বিবাদ হলে সে এই বিভাগে অভিযোগ দায়ের করবে এবং নির্দিষ্ট কাজী সাহেব পুরো বিষয়টির সত্যতা যাচাই-বাছাই করে নির্দিষ্ট কোনো ফায়সালা করবেন।

হযরত মাওলানা কারী ওসমান সাহেব তখন হযরত মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানভি রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রতিষ্ঠিত 'আন-নাদি আল আদাবি' -এর এই বিভাগের কাজী নিযুক্ত ছিলেন। হযরত মাওলানা ফয়জুল হাসান সাহেব, যিনি তখন ছাত্র ছিলেন, পরবর্তী সময়ে তিনিও দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষক নিযুক্ত হন, তাকে ওই বিভাগের প্রধান বিচারপতি নির্বাচন করা হয়। 'আন-নাদি'-এর প্রতিটি প্রোগ্রামে হযরত কারী সাহেব খুবই গুরুত্বের সাথে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যে খুবই পারদর্শী ছিলেন। এই একটি বিষয়ই তাঁকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এমনকি ১৩৮৬ সালে যে বছর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ হন তারপর থেকে শুরু করে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত দারুল উলুমের তাকমিলে আদব বিভাগের সবকগুলো হযরত কারী সাহেবের দায়িত্বে ছিল।

এছাড়াও সম্ভবত ১৯৯৯ সালে হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান সাহেব মুহতামিম থাকাকালে হযরত কারী সাহেবকে নায়েবে মুহতামিম নিয়োগ

দেওয়া হয়। আলহামদুলিল্লাহ! হযরত কারী সাহেব খুব গুরুত্বসহকারে পরিপূর্ণ দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ত্রুটি করেননি। অনেক সুনামের সাথে তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। তাঁর এই দায়িত্বের ধারাবাহিকতা ২০০৮ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এরপর যখন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মধ্যকার বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো দারুল উলুম দেওবন্দের শুরা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে হযরত কারী সাহেব এবং হযরত মাওলানা সাইয়েদ আরশাদ মাদানি নিজেদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। এরপর যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলো আবারও তারা দারুল উলুম থেকে অর্পিত নিজেদের দায়িত্বে পুনর্বহাল হন।

হযরত কারী সাহেবের দায়িত্ব ও কর্মপদ্ধতি

সেই সময় হযরত কারী সাহেব (২০০৮ সালে) নায়েবে মুহতামিম পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে নেন। তবে তিনি এর আগে কখনও নাজিমে তালিমাত এবং কখনও নাজিমে দারুল ইকামা ছিলেন। দারুল উলুম থেকে হযরত কারী সাহেবকে যে দায়িত্বই দেওয়া হয়েছে তিনি তা সবসময় পরিপূর্ণ গুরুত্ব ও সুনামের সাথে পালন করে গিয়েছেন। মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করা খুবই কঠিন কাজ; তাই এদিকে অনেক দিন থেকে আমারও চাওয়া ছিল; আমাকে একজন সহযোগী দেওয়া হোক। বিশেষত এই বছর যখন আমাকে বুখারি শরিফের সবক দেওয়া হলো তখন আমি একটি শর্তে তা কবুল করেছিলাম; আর তা হলো- আমাকে একজন শক্ত ও উদ্যমী সহযোগী দেওয়া হোক। এমনকি আমি হযরত কারী সাহেবের নামও প্রকাশ করেছিলাম। কারণ এ বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। এছাড়া তাঁর ভদ্র মন-মানসিকতা, বুঝবুদ্ধির পরিপক্কতা, নিয়মনীতির ওপর অটল ও অবিচলতা, এই সবকিছুতেই তিনি একদম পরিপক্ক ছিলেন। আমি মজলিসে শুরার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ তারা আমার আবদারটুকু রেখেছেন।

১৪৪২ হিজরি সফর মাসে মজলিসে শুরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যখন এই সিদ্ধান্ত লিখে হযরত কারী সাহেবের কাছে পৌঁছানো হলো, ঠিক পরদিন থেকেই হযরত কারী সাহেব দপ্তরে এসে তার নিজের

টেবিলে এমনভাবে বসলেন, মনে হলো মাঝখানে তিনি তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেননি। নিজের ওপর দায়িত্ব আসার সাথে সাথেই তিনি তাঁর অফিসিয়ালি সব কার্যক্রম শুরু করে দিলেন। শুধু তাই নয়, অফিসের দায়িত্বরত কর্মচারীকে বললেন– রেজিস্ট্রার খাতা নিয়ে এসো। যখন রেজিস্ট্রার খাতা নিয়ে আসা হলো– বললেন, দেখো! কারা কারা উপস্থিত এবং কারা কারা অনুপস্থিত! আমরা সাধারণত (মুহতামিম এবং নায়েবে মুহতামিম) অফিসে একটু দেরিতে উপস্থিত হতাম। কারণ যেসব কাগজে আমাদের দস্তখত করতে হতো সেগুলো একটু দেরিতে অফিসে আসতো। হযরত কারী সাহেব এমন নিয়ম বানিয়ে নিয়েছিলেন যে, প্রথম ঘণ্টাতেই তিনি অফিসে উপস্থিত হয়ে যেতেন। যখন তিনি অফিসে এসে বসতেন; অফিসে কর্মরত সব কর্মচারী অনেক সচেতন হয়ে যেত। আর এভাবেই তিনি এক থেকে দেড় ঘণ্টা অফিসের সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদন করার পর পড়াতে যেতেন এবং আবার চতুর্থ ঘণ্টায় অফিসে বসতেন। এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে সামান্যতমও কোনো অলসতা ছিল না। একটি বিষয় আমি লক্ষ করেছি– অফিসের কাজ যত বেশিই হোক না কেন, তাঁর মধ্যে কখনও কোনো ধরনের বিরক্তিবোধ কিংবা দুর্বলতা দেখা যেতো না। এজন্যই তিনি অনেক কঠিন কাজও খুব সহজেই সমাধান করতে পারতেন।

লকডাউনের সময় হযরত কারী সাহেবের খেদমত

এদিকে লকডাউনের কারণে যখন মাদরাসার নিয়মতান্ত্রিক ক্লাস বন্ধ হয়ে গেল তখন হযরত কারী সাহেব এবং হযরত মাওলানা সায়্যিদ আরশাদ মাদানি সাহেব বললেন– ভাই! এই সুযোগে অলস সময় না কাটিয়ে সব উস্তাদ থেকে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিতে পারি। সবার পরামর্শের ভিত্তিতে অফিসে মিটিং ডাকা হলো এবং ওই মিটিংয়ে তিনটি কমিটি চূড়ান্ত হলো–

১. *ইসলাহি মুআশারা কমিটি*

২. *তাহকিক ও তালিফ (রচনা ও বিশ্লেষণ) কমিটি*

৩. *কুতুবখানা বিষয়ক কমিটি*

১. ইসলাহি মুআশারা কমিটি

একটি কমিটি গঠন করা হয় 'ইসলাহি মুআশারা' নামে। এই কমিটির কাজ ছিল তারা দেওবন্দ এবং দেওবন্দের আশেপাশের এলাকাগুলোর মসজিদ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করবে এবং কোনো এক ওয়াক্ত অথবা কোনো একদিন মসজিদে উপস্থিত হয়ে বয়ান করবে।

বয়ানে যে সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করবেন সেগুলো হলো–

প্রথমত: তাদের সংশোধনের জন্য সমাজের মধ্যে মিশে থাকা মন্দ কাজগুলো থেকে সবাইকে সতর্ক করবে।

দ্বিতীয়ত: দরসে কুরআন তথা যারা একদম কুরআন পড়তে পারে না তাদের কুরআন পড়াবে।

তৃতীয়ত: সবাইকে কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শেখানো। বিশেষত যে সমস্ত শিশু কুরআন পড়া শিখেছে কিন্তু এখনও তাদের তেলাওয়াত পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ না; তাদেরকে তেলাওয়াত বিশুদ্ধ করিয়ে দেবে।

চতুর্থত: সপ্তাহের কোনো একদিন সময় করে 'দরসে হাদিস' তথা কোনো একটি হাদিস পাঠ করে তার অনুবাদ এবং যতটুকু সম্ভব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সবাইকে বুঝিয়ে দেবে।

পঞ্চমত: বিভিন্ন মৌলিক দীনি মাসয়ালা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করা। হযরত কারী সাহেব এই কমিটির দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কাজ শুরু করে দিলেন। দেওবন্দ এলাকায় মসজিদের সংখ্যা মোট ১২০টি। তিনি এই মসজিদগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করলেন এবং পুরো তিন দিন সময় নিয়ে ওই মসজিদগুলোর মুতাওয়াল্লিদের ডাকালেন। দারুল উলুমের মেহমানখানায় তাদের সাথে পরামর্শ করলেন। তাদের সামনে তার কাজের পরিপূর্ণ পরিকল্পনা এবং পদ্ধতি উপস্থাপন করলেন। তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই মসজিদে কোনো একজন উস্তাদ পাঠাতেন। আর এভাবেই তিনি দেওবন্দের প্রত্যেকটি মসজিদে তাঁর কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিলেন! তাঁর রেখে যাওয়া এই সিলসিলা এখনও চলমান লকডাউনে জারি আছে আলহামদুলিল্লাহ।

২. তাহকিক ও তালিফ (রচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ) কমিটি

দ্বিতীয় কমিটি গঠন হয় বিভিন্ন কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং রচনা বিষয়ক কাজের জন্য। এই কমিটিতে যাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়; তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়– তারা যেন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নতুন নতুন কিতাব রচনা করেন। এছাড়াও বলা হয়– আমাদের আকাবিরের লিখিত যেসব কিতাবাদির পুরনো পাণ্ডুলিপি রয়েছে সেগুলো বর্তমান সময়ের সঙ্গে যুগোপযোগী করে আবার নতুন করে যেন সম্পাদনা করা হয়। এই কাজগুলোর জন্য যে কমিটি গঠন করা হয় সেই কমিটিরও দায়িত্ব দেওয়া হয় হযরত কারী উসমান সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে। আলহামদুলিল্লাহ! কমিটি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই হযরত কারী সাহেবের দিকনির্দেশনায় দায়িত্বে থাকা সবাই তাদের কাজ শুরু করে দেন। এখন পর্যন্ত এটার ৬/৭টি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়ছে এবং তাদের সবার কাছ থেকে কাজের সার্বিক খবরা-খবর নেওয়া হয়েছে। যেসব কিতাবের কাজ মোটামুটি সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো অন্য কারও কাছে পাঠানো হয়েছে, যাতে করে তিনি কাজটি নিখুঁত করার জন্য পুনরায় সম্পাদনা করেন। হযরত কারী সাহেব প্রত্যেকটি কাজকেই খুবই গুরুত্বের সাথে আঞ্জাম দেন; কোনো কাজকে স্রেফ নিজের গা বাঁচানোর জন্যে আবছা আবছা সম্পাদনা করে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত করতে চান না। প্রতিটি কাজই যেভাবে করা দরকার সেভাবেই সম্পন্ন করেন।

৩. কুতুবখানা বিষয়ক কমিটি

তৃতীয় যে কমিটি গঠন করা হয়; সেই কমিটির কাজ ছিল– কুতুবখানায় অনেক আগ থেকেই যেসব কিতাবাদি একই রেজিস্ট্রারের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলোর রেজিস্ট্রার পৃথক করা। তাদের বলা হয়– তারা যেন সিলেবাসভুক্ত কিতাব এবং এর বাইরের কিতাবগুলোকে পৃথক করে নতুনভাবে দুই শ্রেণির কিতাবের জন্য দুটি রেজিস্ট্রার করেন। এটাও ছিল হযরত কারী সাহেবের এক অনন্য চিন্তা; যা সবাই খুশিমনে এবং গুরুত্বের সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন। ঠিক এভাবে দারুল উলুম দেওবন্দের শুরা কমিটি সিদ্ধান্ত নিলো দারুল উলুম দেওবন্দের আশপাশ এবং শহরগুলোতে ভালো করে খোঁজখবর নেওয়া এবং দারুল উলুম দেওবন্দের অধীনে আরও নতুন নতুন কিছু মকতব প্রতিষ্ঠা করা।

হযরত কারী সাহেবে শুরা কমিটির পক্ষ থেকে প্রেরিত এই প্রস্তাবটি পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তা বাস্তবায়নে নেমে পড়লেন। মক্তবগুলোর দায়িত্বশীলদের নিয়ে বসলেন। দেওবন্দের শুরা কমিটির অন্যতম সদস্য মাওলানা আনওয়ার হোসাইন সাহেবকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। সবাইকে দফতরে একত্রিত করে পর্যবেক্ষণের জন্য তাদেরকে বিভিন্ন এলাকায় পাঠালেন। তারপর এলাকাগুলোর সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ৪/৫টি মক্তব প্রতিষ্ঠা করে সেগুলোতে শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগ দিলেন।

দফতর: তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়াত

যখন কাদিয়ানি ফেতনাকে রুখে দেওয়ার জন্য দারুল উলুম দেওবন্দে আলমি তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো এবং মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত প্রতিষ্ঠা করা হলো, তখন হযরত কারী সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহিকে এর সেক্রেটারি নির্বাচন করা হলো। হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি এবং দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম সাহেবকে সেটার সভাপতি নির্বাচন করা হলো। ঠিক তখন থেকেই হযরত কারী সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি সে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। এই দায়িত্ব পালনের জন্য সবসময় তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। সেক্রেটারি হযরত কারী ওসমান সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং সহ-সেক্রেটারি হযরত মাওলানা শাহ আলম গৌরীপুর, দুজনে মিলেই মাশাআল্লাহ এই বিভাগের অধীনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। এটার অধীনে দেশের আনাচে-কানাচে অসংখ্য সভা-সেমিনার করেছেন। এছাড়াও দেশের যেসব স্থানে ফিতনায়ে কাদিয়ানিয়্যাত মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল প্রত্যেকটা জায়গায় 'শুবায়ে ইসলামিয়া' নামে মারকাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এসব মারকাজকে দেখভালের জন্য উস্তাদদের প্রেরণ করেন। এই বিভাগের দায়িত্বশীল ছিলেন হযরত কারী সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি। আমি তো কেবল হযরত কারী সাহেবের সামান্য কিছু কাজের নমুনা আপনাদের সামনে পেশ করলাম। এছাড়াও 'আন-নাদি আল আদাবি'-এর ছাত্রদের দেখভাল করা, মাদানি দারুল মুতালায়ালার নেগরানি, সমস্যায় জর্জরিত যেকোনো ছাত্রদের সমস্যা সমাধানসহ যে কারও বিপদে হযরত কারী

সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতেন। তাঁর অন্যতম একটি গুণ ছিল তিনি নিয়মনীতি খুব পছন্দ করতেন; নিয়মনীতির বাইরে কোনো কাজ করতেন না। নিয়মের বাইরে কারও কোনো কাজ গ্রহণও করতেন না। কারণ হযরত মাওলানা কারী উসমান সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন হযরত মাওলানা মাহবুবুর রহমান সাহেবের সাথে। এজন্য তিনি প্রত্যেকটি কাজের উসুল এবং পদ্ধতি বেশ ভালো করেই জানতেন এবং বুঝতেন। সর্বোপরি হযরত কারী সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহিকে আমার সহযোগী হিসেবে পেয়ে আমি খুবই আশান্বিত এবং সাহসী ছিলাম।

নায়েবে মুহতামিমদের খেদমত

আমাদের নায়েবে মুহতামিমদ্বয়– হযরত মাওলানা আব্দুল খালেক সাম্ভলি সাহেব এবং হযরত মাওলানা আব্দুল খালেক মাদরাজি সাহেব আগে থেকেই ছিলেন এবং নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছেন। তবে বর্তমানে মাওলানা আব্দুল খালেক মাদরাজি সাহেব ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম হিসেবে কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। বিস্ময়কর বিষয় হলো, দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক নির্বাহী মুহতামিম হযরত মাওলানা গোলাম রসুল সাহেবের যখন ইন্তেকাল হলো এবং অন্যদিকে দারুল উলুম দেওবন্দের তৎকালীন মুহতামিম হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান সাহেবও ভীষণ অসুস্থ হয়ে নিজ এলাকায় চলে গেলেন, ঠিক তখনও তার দুই মাসের অনুপস্থিতির সময়টাতে দারুল উলুমের সমস্ত কার্যাবলী এবং জিম্মাদারি হযরত মাওলানা আব্দুল খালেক মাদরাজি খুব নিখুঁতভাবে পালন করেন। এবারও দারুল উলুমের নির্বাহী মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী সায়্যিদ মুহাম্মদ উসমান মনসুরপুরির ইন্তেকাল হয়েছে; আমারও শরীর তেমন একটা ভালো না, তাই আমি গ্রামেই অবস্থান করছি, জানা নেই আর কবে দারুল উলুম ফিরব; ঠিক এই সময়েও দারুল উলুম দেওবন্দের নায়েবে মুহতামিম হযরত মাওলানা আব্দুল খালেক মাদরাজি সাহেব দারুল উলুমের সমস্ত কার্যাবলী এবং জিম্মাদারি আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাওলানা আব্দুল খালেক মাদরাজি সাহেব; মাওলানা আরশাদ সাহেব;

মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ সাহেব; মাওলানা কমরুদ্দীন সাহেবসহ বাকি সব উস্তাদকে পরিপূর্ণ সুস্থ এবং হেফাজতে রাখুন।

কবি তাঁর কবিতায় বলেন–

'কায়েসের মৃত্যু তো কেবল একাই কায়সের মৃত্যু না, বরং (তার মৃত্যু তো) পুরো একটি দালান ধ্বংস করে দিয়েছে।'

এমন ব্যক্তি যিনি একাই নিখুঁতভাবে সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদন করতেন, একাই অনেকের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে নিতেন, তার মৃত্যু তো অবশ্যই ব্যবস্থাপনায় আঘাত হানবে। সংকট দেখা দেবে। এজন্য মহান রবের কাছে মন থেকে আর্জি জানাচ্ছি– তিনি যেন আমাদেরকে এর উত্তম বদলা দান করেন। যদিও বাহ্যিকভাবে প্রত্যেক জিনিসের উত্তম বদলা পাওয়া খুবই দুষ্কর।

আমাদের করণীয় কী?

এমন একজন অভিভাবক এবং ইলমের সমুদ্র আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, এখন আমাদের কী করা উচিত? হযরত মাওলানা আবুল কাসিম নোমানি সাহেব তার বক্তৃতার শেষ দিকে এসে এই কথাটাই বারবার বলছিলেন। এখন আমাদের করণীয় কী? এটাই দুনিয়ার চিরাচরিত নিয়ম যে, 'বড়দের মৃত্যু আমাদেরকে বড় বানিয়ে দেয়' অর্থাৎ বংশের মধ্যেও এটাই হয় যে– দাদার মৃত্যুর পর বাবা তার জায়গায় সমাসীন হয়; আর বাপ মৃত্যুবরণ করার পর ছেলে তার জায়গা দখল করে। আজকের ছেলেই আগামীকালের বাবা। এক সময় এই ছেলেই এই পরিবারের দায়িত্ব আদায় করে। আমরা যদি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে ওরকমটাই দেখতে পাবো। ব্যবসা হোক আর বংশ; যখন বড়রা চলে যায় তখন ছোটরা তাদের জায়গায় সমাসীন হয়। সুতরাং যখন বড়দের আসনে চলে আসে তখন আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন তাদেরকে বড়দের মতো করে কাজ করার সে যোগ্যতা দিয়ে দেন। ইলমের প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রেও এর বিকল্প নেই। মহারথি আলেমরা চলে যাবেন, তরুণ আলেমরা বড়দের জায়গায় সমাসীন হবেন, তাদের রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করবেন এবং তারাই একসময় আকাবির হবেন। এই পৃথিবীতে কেউ চিরস্থায়ী না, প্রত্যেক আগন্তুকই জানে তাকে একদিন চলে যেতে হবে।

এজন্য তাদের কাজকে নিজের কাজ মনে করেন; তাদের চিন্তা-চেতনা এবং লক্ষ্যকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রাণপণ চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কেবল সন্তানাদির ক্ষেত্রেই উত্তরাধিকারী শব্দ বলা উচিত না; যারা এই বিষয়ে তাদেরকে অনুসরণ করে এবং তাদের লক্ষ্য কে নিজেদের লক্ষ্য মনে করে, তাদের বিদায় নেওয়ার পর সেই উক্ত কাজের একজন উত্তরাধিকারী। আর উত্তরাধিকারীর দায়িত্ব হলো–সে তার পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া আমানতের যথাযথ হেফাজত করবে এবং সেটার সমৃদ্ধির জন্য সবসময় যথাযথ চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। কখনও সে তাদের রাস্তা থেকে পদচ্যুত হবে না।

আরেকটি কথা হলো, যে কারও মৃত্যু আমাদের মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়। মুহাজিররা যখন হিজরত করে মদিনায় এলেন তখন সেখানে প্রচণ্ড জ্বরের মহামারি ছিল। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গেলেন। তখন তিনি এই কবিতা পড়ছিলেন–

'মৃত্যু প্রত্যেক মানুষকেই তার ঘরে এসে ভোরবেলা শুভসকাল জানিয়ে যায়, অথচ মৃত্যু আমাদের জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী।'

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে এই অভিবাদন জানায় যে– তোমাদের সকাল শুভ হোক। কিন্তু তার ভাগ্য বলে– মৃত্যু তোমার খুবই কাছাকাছি। এটাই তোমার ভাগ্যে লেখা রয়েছে। কোনো মানুষই জানে না কখন তার মৃত্যু আসবে।

হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন জ্বরে আক্রান্ত হন তখন তিনি এই কবিতা পড়ছিলেন, যার অনুবাদ এই–

> *'হায় কেউ যদি আমাকে বলতো, আমি মক্কা উপত্যকায় কোনো একটি রাত এমনভাবে যাপন করব যে, আমার চতুর্পাশে ইযখির এবং জলিল নামক ঘাস ফুটে আছে। আমি কি কখনও মুজান্নাহ নামক পানির ঘাটে পৌছাব? শামা এবং তুফাইল নামক পাহাড় কি আমার দৃষ্টিগোচর হবে?'*
>
> *এই চরম অবস্থা দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করলেন– হে আল্লাহ! এই মহামারিকে জুহফার দিকে স্থানান্তরিত করে দিন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়া কবুল হলো এবং এই মহামারি মদিনা*

থেকে জুহফার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে গেল। মক্কা একদম পূত-পবিত্র হয়ে গেল।

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলতে থাকতেন–

'প্রত্যহ ঘোষণা হচ্ছে আজ অমুক ইন্তেকাল করেছেন, নিশ্চিত একদিন এই ঘোষণা হবে উমর ইন্তেকাল করেছে।'

এই ঘটনা এবং মৃত্যুর উপর্যুপরি সংবাদ আমাদের মৃত্যুকে বারবার স্মরণ করিয়ে যায়। হযরত শায়খ রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর রিসালা ফাজায়েলে একটি ঘটনা লিখেন– সম্ভবত ঘটনাটি হযরত জুন্নুন মিসরি রাহিমাহুল্লাহুর। একটি জানাজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একজন জিজ্ঞেস করলো– জানাজাটি কার? তারা বলল, জানাজাটি তোমার! তারপর তারা আবারও বললো জানাজাটি তোমার! একথাটি যদি তোমার বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় তাহলে মনে করে নাও এটি আমার জানাজা। একথা বলার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল– প্রত্যেকটি মৃত্যুই আমাদেরকে আমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়।

মৃত্যু চিরন্তন সত্য

জীব মাত্রই মরণশীল। জীবশ্রেষ্ঠ মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। পবিত্র কুরআনে কারিমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ﴾

'প্রত্যেক প্রাণীকেই মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।'[১৯]

আল্লাহ পাক আরও বলেছেন–

﴿يُحْيِ وَيُمِيتُ﴾

'তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান।'[২০]

তিনি আরও বলেছেন–

﴿نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ﴾

---

১৯. সুরা আলে ইমরান: আয়াত ১৮৫

২০. সুরা তাওবা: আয়াত ১১৬

'আমি তোমাদের মৃত্যুর সময় ঠিক করে দিয়েছি। আর নির্ধারিত সময়ের আগে মৃত্যু দেবো না।[২১]

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুর অনিবার্যতার কথা বলেছেন। উল্লেখ করেছেন মৃত্যু থেকে কেউ রেহাই পাবে না, পালিয়ে যেতে পারবে না। আর মৃত্যুর পর কেয়ামতের দিন সবাইকে জীবিত করা হবে এবং কর্মফল দেওয়া হবে।

তার স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা–প্রত্যেক প্রাণীকেই মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। কেয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল পুরা করে দেওয়া হবে। যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে যেতে দেওয়া হবে, সেই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন তো ছলনার ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।[২২]

অন্যত্র তিনি জানিয়েছেন– তিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন, যাতে যাচাই করতে পারেন কে বেশি ভালো। তিনি মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাশীল।[২৩]

অবধারিত জেনেও অনেকে মৃত্যুকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে চায় না। মৃত্যুকে ভুলে যেতে বা ভুলে থাকতে চায়। তাদের কেউ কেউ পার্থিব লোভ-লালসা ও ভোগবিলাসে এতোই মত্ত থাকে যে, মৃত্যুর কথা তাদের স্মরণেই আসে না। দুনিয়ার চাকচিক্যে যেকোনো ধরনের অন্যায়, অনাচার, অপকর্ম ও অপরাধ করতেও তারা দ্বিধা করে না। তাদের স্বভাব, আচার, ব্যবহার ও কর্ম থেকে মনে হয়, মৃত্যু কখনোই তাদের নাগাল পাবে না। মহান আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে মান্য করা, সৎকর্ম করা ও যাবতীয় অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকা দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হওয়ার পূর্ব শর্ত হলেও তারা এটাকে গুরুত্ব দেওয়ার গরজ অনুভব করে না।

মৃত্যু বা পরিণতির কথা ভুলে দিন কাটাতে তারা অধিক পছন্দ করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শ্রেণির লোকদের

---

২১. সুরা ওয়াকিআহ: আয়াত ৬০
২২. সুরা আলে ইমরান: আয়াত ১৮৫
২৩. সুরা মুলক: আয়াত ২

বুদ্ধিহীন, জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত ও অসতর্ক বলে অভিহিত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদিসে আছে– এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকদের মধ্যে কে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি? উত্তরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– লোকদের মধ্যে যে মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করে এবং তার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রস্তুতি গ্রহণ করে সেই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি। সে দুনিয়ায় সম্মান ও পরলোকে মর্যাদা দুই-ই লাভ করতে পারবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করা এবং মৃত্যুর জন্য বেশি করে প্রস্তুত হওয়ার তাকিদ দিলেও অধিকাংশ মানুষ মৃত্যুকে সেই রকম গুরুত্ব দেয় না। তারা মৃত্যুকে অস্বীকার করে না বটে, (অস্বীকার করার উপায় নেই) তবে যথাযথ আমলেও নেয় না। ভাবে, মৃত্যু এখনই তাদের পাকড়াও করবে না, আরও বহুদিন তারা বেঁচে থাকবে। আশপাশের কারও মৃত্যু তাদের সতর্ক করে না। প্রত্যেকেই স্বস্তি অনুভব করে এই ভেবে যে, 'আমি তো বেঁচে আছি।' এভাবে ভ্রান্তির ছলনে ভুলে থাকা কতদূর সমীচীন, সেটা সবারই ভাবা উচিত।

অনেকে মৃত্যুকে দূরে রাখার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে না। আসলে এটা ব্যর্থ চেষ্টা ও মৃত্যুকে দূরে রাখা সম্ভব নয়। নির্ধারিত সময়েই সে আসবে। অসুস্থতা বিশেষ করে গুরুতর অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য অনেকে দেশ থেকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাড়ি জমাতে পিছপা হয় না। উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য যেকোনো দেশে যাওয়াতে কোনো দোষ নেই, তবে যদি কেউ মনে করে, বিদেশে উন্নত চিকিৎসায় তার হায়াত বাড়বে, তবে মস্ত বড় ভুল হবে। প্রকৃত অর্থে হায়াত বাড়ে না। বাড়ানো যায় না।

আল্লাহ তায়ালা যতদিন হায়াত রেখেছেন ততদিনই কেউ বেঁচে থাকে। তিনি মৃত্যুর সময় নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এর এক সেকেন্ড এদিক-সেদিক হবে না।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ﴾

'তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ দুর্গে থাকলেও।'[২৪]

সুতরাং, মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করতে হবে। একই সঙ্গে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতিও নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, মৃত্যুচিন্তা অনাচার, অপকর্ম ও অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে, আল্লাহমুখি করতে অনুপ্রাণিত করে।

যে আটটি আমলে সৌভাগ্যময় মৃত্যু লাভ হয়

একজন মুমিনের পরম প্রত্যাশিত বিষয় হলো ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুর সৌভাগ্য লাভ। আর মুমিনের শেষ পরিণাম কীভাবে শুভ হবে, এর জন্য রয়েছে কার্যকর কিছু উপায় তথা আমল। সৌভাগ্যের মৃত্যুর সেসব আমল ও উপায় অবলম্বন নিয়েই আলোকপাত করছি।

১. আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন

ঈমান মুমিনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। যে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে এবং এর ওপর অবিচল থাকে মৃত্যুর সময় তার কোনো যন্ত্রণা থাকে না; বরং তার শেষ পরিণাম শুভ হয়।

ইরশাদ হয়েছে–

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾
﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

'নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ অতঃপর অবিচল থাকে, (মৃত্যুর সময়) তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিকারী! তারা তথায় চিরকাল থাকবে। তারা যে কর্ম করত, এটা তারই প্রতিফল।'[২৫]

---

২৪. সুরা নিসা: আয়াত ৭৫
২৫. সুরা আহকাফ: আয়াত ১৩-১৪

২. ভালো কাজে আত্মনিয়োগ

কোনো মুমিনের শেষ পরিণাম ভালো হওয়ার আলামত হলো, মৃত্যুর আগেই যাবতীয় পাপ থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করা এবং সৎকাজ ও আল্লাহর আনুগত্যের তাওফিকপ্রাপ্ত হওয়া। হাদিস শরিফে এসেছে–
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–
'আল্লাহ যদি তাঁর কোনো বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাহলে তাকে কাজ করার তাওফিক দেন। প্রশ্ন করা হলো– হে আল্লাহর রাসুল! তিনি কীভাবে তাকে কাজ করার তাওফিক দেন? তিনি বলেন, তিনি সেই বান্দাকে মৃত্যুবরণের আগে সৎ কাজের সুযোগ দান করেন।[২৬]

৩. শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

বিখ্যাত সাহাবি মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'যে ব্যক্তির শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে (অর্থাৎ এই কলেমা পড়তে পড়তে যার মৃত্যু হবে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২৭]

সুতরাং মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘবে অধিক পরিমাণে এই কলেমা পাঠের বিকল্প নেই।

৪. আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ

মুমিনমাত্রই আল্লাহর প্রতি এই সুধারণা পোষণ করবে যে– তিনি অবশ্যই মৃত্যুর সময় বান্দার মৃত্যু কষ্ট লাঘব করবেন। কারণ আল্লাহর প্রতি যে যেমন ধারণা করবে আল্লাহ তার সঙ্গে এমন আচরণই করবেন। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার সম্পর্কে আমার বান্দার ধারণা মোতাবেক আমি আচরণ করি। আমি তার সঙ্গে থাকি।[২৮]

অন্য হাদিসে জাবির রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন– রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের তিন দিন আগে তাঁকে আমি এ কথা

---

২৬. সুনানু তিরমিজি, হাদিস ২১৪২
২৭. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস ২২০৩৪
২৮. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৭৪০৫

বলতে শুনেছি যে, তোমাদের সবাই যেন আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা পোষণরত অবস্থায় মারা যায়।[২৯]

৫. নামাজের প্রতি যত্নশীল

যারা ফরজ ও সুন্নত নামাজের প্রতি যত্নশীল হবে মহান আল্লাহ তাদের মৃত্যুযন্ত্রণা সহজ করবেন এবং জান্নাতে তাদের বিশেষ স্থান দেবেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

'যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সংরক্ষণ করবে তথা যথাযথভাবে অজু করে যথা সময়ে উত্তমরূপে রুকু-সেজদা করে নামাজ আদায় করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।'[৩০]

তাছাড়া সুন্নত নামাজের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সব সময় ১২ রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন। এই সুন্নাতগুলো হলো, জোহরের (ফরজের) আগে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের (ফরজের) পর দুই রাকাত। ইশার (ফরজের) পর দুই রাকাত এবং ফজরের (ফরজের) আগে দুই রাকাত।'[৩১]

৬. পুণ্যের কাজে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা

প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো পুণ্যের কাজ পছন্দ করা। ভালো কাজের প্রচেষ্টা করা। আর পুণ্যের কাজে প্রচেষ্টা মুমিনের মৃত্যুযন্ত্রণা সহজ করে। আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

'ভালো ও পুণ্যের কাজ খারাপ মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে রাখে, গোপনে দান আল্লাহর ক্রোধ ঠান্ডা করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ও বয়স বৃদ্ধি করে।'[৩২]

---

২৯. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৭১২১
৩০. মুসনাদে আহমদ: ৪/২৬৭
৩১. সুনানু তিরমিজি, হাদিস নং ৪১৪
৩২. তাবরানি কাবির, হাদিস নং ৮০১৪

৭. বেশি পরিমাণে মৃত্যুর স্মরণ

মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করার বড় একটি উপকার হচ্ছে, অন্তর থেকে দুনিয়ার আসক্তি দূর হয় এবং পরকালের চিন্তা সৃষ্টি হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

'সব ভোগ-উপভোগ বিনাশকারী মৃত্যুকে তোমরা বেশি বেশি স্মরণ করো।'[৩৩]

৮. কবর জিয়ারতে মৃত্যুর স্মরণ

কবর জিয়ারত মৃত্যু ও আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্তরে কবরের শাস্তির ভয়াবহতা সৃষ্টি করে। ফলে এর দ্বারা অন্যায় থেকে তওবা এবং মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণে সাহায্য করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

'আমি তোমাদের এর আগে কবর জিয়ারতে নিষেধ করেছিলাম, এখন থেকে কবর জিয়ারত করো। কেননা, তা দুনিয়াবিমুখতা এনে দেয় এবং আখেরাতের স্মরণ করিয়ে দেয়।'[৩৪]

প্রত্যেকের মৃত্যুর স্থান নির্ধারিত

মাওলানা রুমি তাঁর মসনবি শরিফে একটি কাহিনি লিখেন–

> *'একদিন দুপুরে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁর শাহি দরবারে বসে আছেন। এমন সময় এক লোক হন্তদন্ত হয়ে সেখানে ছুটে এলো। লোকটি আল্লাহর নবীকে দেখেই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। হযরত সুলাইমান তার এরকম অবস্থা দেখে খানিকটা অবাক হয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন– 'কী হয়েছে তোমার? এমন করছ কেন? কী চাও তুমি?'*

> লোকটি বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল– 'হে আল্লাহর নবী! হে মহান বাদশাহ! আমাকে আজরাইলের হাত থেকে বাঁচান। আমি আজ আজরাইলকে দেখেছি। আমার দিকে ভীষণ ক্রোধের সঙ্গে তাকিয়ে ছিল।

---

৩৩. সুনানু তিরমিজি, হাদিস নং ২৩০৭

৩৪. সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৫৭১

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম লোকটিকে অভয় দিয়ে বললেন– 'এতে ভয়ের কী আছে! আজরাইল হচ্ছেন আল্লাহর মহান ফেরেশতা। তিনি কেবল আল্লাহর হুকুমেই জান কবজ করেন। আমি তো প্রায় প্রতিদিনই আজরাইলকে দেখি কিন্তু কই আমি তো ভয় পাই না। যাইহোক, এখন বলো– তোমার জন্য আমি কী করতে পারি, তুমিই কী চাও?'

লোকটি বলল– 'আপনি ভয় না পেলে কী হবে, আমি আজরাইলকে ভীষণ ভয় পাই। কিন্তু আজ তার রাগ দেখে আরও ভয় করছে। তার কাছ থেকে আমি বাঁচতে চাই। লোকেরা বলে থাকে– বায়ু সুলায়মান আলাইহিস সালামের হুকুম পালন করে। এখন আপনি বায়ুকে হুকুম করুন আমাকে এ দেশ থেকে দূরে নিয়ে যাক। মানুষ একথাও বলে থাকে যে– বাদশাহ সুলাইমান মানুষের চাওয়া-পাওয়া পূরণ করে থাকেন। এখন আমার দাবি হলো– বাতাসকে এক্ষুণি হুকুম দিন আমাকে হিন্দুস্তান নামক দেশে নিয়ে যাক। আমি চাই আজরাইল যেহেতু এদেশে আমার ঠিকানা জেনে গেছে সেহেতু এদেশে আর থাকব না। আপনি দয়া করে আমাকে হিন্দুস্তানে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।'

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বেচারার কাকুতি-মিনতি ও কান্নাকাটি দেখে বললেন– 'বেশ ভালো কথা। জীবন-মরণের ভার আমার হাতে নেই। তবে বায়ু আমার কথা শুনে থাকে। যাও তোমার দাবি আমি পূরণ করব। এক্ষুণি বায়ুকে বলছি তোমাকে হিন্দুস্তানে নিয়ে যাক।'

হুকুম পেয়ে বাতাস লোকটিকে হযরত সুলাইমানের গালিচায় বসিয়ে কয়েক মুহূর্তেই বনবাদাড়, মরু সাহারা, নদ-নদী ও সাগর-দরিয়া পার হয়ে হিন্দুস্তানের এক শহরে পৌঁছে দিল।

সেদিন পার হলো। পরের দিন হযরত সুলাইমান তার দরবারে বসে আছেন। এমন সময় হযরত আজরাইল আলাইহিস সালাম সেখানে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখেই সুলাইমান আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন– 'হে আজরাইল! গতকাল এক লোক ভীত অবস্থায় আমার দরবারে এসেছিল এবং তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে। সে বলেছে– তুমি নাকি তার দিকে মারাত্মক ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলে! লোকটি আমার কাছে অনুরোধ জানালো, আমি যেন বাতাসকে নির্দেশ দেই যাতে তাকে ওই মুহূর্তেই এই শহর থেকে হিন্দুস্তানে পৌঁছে দেয়। আমি তাকে হতাশ করতে চাইনি। বাতাসকে তার ইচ্ছেমতো হিন্দুস্তানে পৌঁছে দিতে হুকুম করলাম। এখন সে হয়ত হিন্দুস্তানেই আছে। কিন্তু আমি খুব বিস্মিত হয়েছি যে– আল্লাহর এত বড় একজন ফেরেশতা হয়ে তুমি কেন তাকে ভয় দেখালে। বেচারা তোমার ভয়েই আজ ঘরবাড়ি ও দেশছাড়া হলো।'

হযরত সুলাইমানের কথা শুনে আজরাইল আলাইহিস সালাম বললেন– 'আমি আল্লাহর হুকুম পালন ও তার আদেশ মানা ছাড়া আর কিছুই করি না। ওই লোকটির প্রতি আমি রাগ করে কিংবা ক্রোধের দৃষ্টিতে মোটেই তাকাইনি। সে ঠিকই বলেছে– আমি তাকে গতকাল এই বায়তুল মুকাদ্দাস শহরে দেখেছি। তার প্রতি আমি যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম তা আসলে বিস্ময়ের দৃষ্টি ছিল। কারণ– আল্লাহর নির্দেশ ছিল গতকালই যেন হিন্দুস্তানে তার জান কবজ করি। তাই তাকে তার মৃত্যুর

মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে বায়তুল মুকাদ্দাসে দেখে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে যাই যে, কী করে সে এখন এই এলাকায় ঘোরাফেরা করছে! তাকে দেখে আমি মনে মনে ভাবলাম– তার যদি শত শত পাখাও গজায় তাহলেও সে আছরের আগে হিন্দুস্তান পৌঁছুতে পারবে না। যাইহোক, যেহেতু তখনও তার মরণের সময় উপস্থিত হয়নি সেহেতু খুব আশ্চর্য হয়েই তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম এবং পাশ কেটে হিন্দুস্তানে চলে গেছি। কিন্তু সময়মতো হিন্দুস্তানে পৌঁছেই দেখি সেখানে নির্ধারিত স্থানে হাজির! এরপর আর দেরি না করে তার জান কবজ করে নিই।'

সব শুনে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন– একদম ঠিক কথা। সবকিছু থেকে পালানো সম্ভব কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে পালানো সম্ভব নয়। তার সেই মুহূর্তে অবশ্যই হিন্দুস্তানে থাকা দরকার ছিল। কিন্তু বায়ু ছাড়া তাকে সেই মুহূর্তে সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সে নিজেই নিজ ইচ্ছায় আমার কাছে ছুটে এলো এবং নিজের মুখেই কাকুতি-মিনতি করে নিশ্চিত পরিণতির দিকে ছুটে গেল।

কুরআনে কারিমে আল্লাহ পাক অসংখ্য জায়গায় ইরশাদ করেছেন–

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ﴾

'তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও।'[৩৫]

দিন যত এগুচ্ছে– আমরা তত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি। আমরা কেউ জানি না, কখন কোথায় কীভাবে মৃত্যুবরণ করবো! প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তার সঠিক সময় এবং সঠিক জায়গায় আসে। আমরা কেউ জানি না, আল্লাহ পাক আমাদের মৃত্যু কখন কোথায় এবং কীভাবে

৩৫. সুরা নিসা: আয়াত ৭৮

লিখে রেখেছেন! মোটকথা– আল্লাহ পাক আমাদের ভাগ্যে যেভাবে মৃত্যু লিখে রেখেছেন; মৃত্যু সেভাবেই আমাদের সামনে উপস্থাপন হবে। এজন্য সব সময় আল্লাহর কাছে ভালো মৃত্যু কামনা করা এবং অমঙ্গল মৃত্যু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। আল্লাহর কাছে সব সময় এই দোয়া করা– 'হে আল্লাহ! আমাকে ভালো মৃত্যু দান করুন; এবং অমঙ্গল মৃত্যু থেকে হেফাজত করুন। পাশাপাশি মৃত্যুর সময় তোমার পরিপূর্ণ ঈমান নসিব করুন।'

অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা

এজন্য উপরের ঘটনা আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে– আমরা যেন সবসময় নিজেদের মৃত্যুর ব্যাপারে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করি। কখনও এটা মনে করা যাবে না যে– আজ তো আমি যুবক! যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হবো; তখন আমার আমল এবং ইবাদতগুলো আরও বাড়িয়ে দেব। এখন তো আমার খেলাধুলা করার বয়স। অথচ মৃত্যুর সময় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন– কিছু লোক এমন রয়েছে যারা শৈশবকালে মৃত্যুবরণ করেন। আবার কেউ তো এমন রয়েছে; যারা পরিপূর্ণ বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং বাচ্চা কি মৃত্যুবরণ করে না? যুবকরা কি মৃত্যুবরণ করে না? এমনকি কেউ রয়েছে যারা অসুস্থ হয়; আর মৃত্যুবরণ করে না। দুনিয়াতে কেউ চিরস্থায়ী? কেউ চিরস্থায়ী না; প্রত্যেকের মৃত্যুর সময় আল্লাহ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত; যখনই নির্ধারিত সময় চলে আসবে, অবশ্যই প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।

এজন্য মৃত্যুবরণ করলে কেবল আমরা শোক আদায় করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবো না। নিজের মৃত্যুর প্রস্তুতি নেবো। কারণ– আজ হোক কিংবা কাল আমাকেও সেই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। এজন্য মৃত্যুর প্রস্তুতি হিসেবে প্রথম কাজ হবে আমাকে নিজের সব অপরাধ থেকে আল্লাহর কাছে মন থেকে তাওবা করা।

মোটকথা, হযরত কারী সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আজ আমাদের থেকে চিরস্থায়ী বিদায় নিয়ে অনন্তকালের পথে যাত্রা শুরু করেছেন। আমরা দোয়া করি– আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাঁর সকল ইলমি

খেদমত কবুল করুন। তিনি মাদরাসা, মসজিদ, দরস-তাদরিসের যেসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন আল্লাহ পাক যেন তার জায়গায় যথোপযুক্ত যোগ্য ব্যক্তি দান করেন। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন যেন তাঁর সাথে রহমত এবং মাগফেরাতের আচরণ করেন। তার দুই সন্তান; হযরত মাওলানা মুফতি সালমান মানসুরপুরি এবং হযরত মাওলানা মুফতি আফফান মানসুরপুরি, মাশাআল্লাহ! দুজনেই বেশ যোগ্য ও গভীর ইলমের অধিকারী। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন তাদের দুজনকেও যোগ্য পিতার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে কবুল করুন। তাঁর ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ' 'দারুল উলুম দেওবন্দ' এবং অন্যান্য যেসব দীনি মারকাজ অভিভাবকশূন্যতার সংকটে আছে; আল্লাহ তায়ালা যেন ওই জায়গাগুলোতে তাঁর উত্তম বদলা দান করেন। আমি এক নগণ্য বান্দা; যা কিছু বললাম– কোনো ভুলত্রুটি হলে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন যেন ক্ষমা করেন। আমাদের সবাইকে মৃত্যুর পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফিক দান করুন।

দারুল উলুম দেওবন্দের ইবনে হাজারখ্যাত মুহাদ্দিস, বহুগ্রন্থ প্রণেতা, হযরত মাওলানা
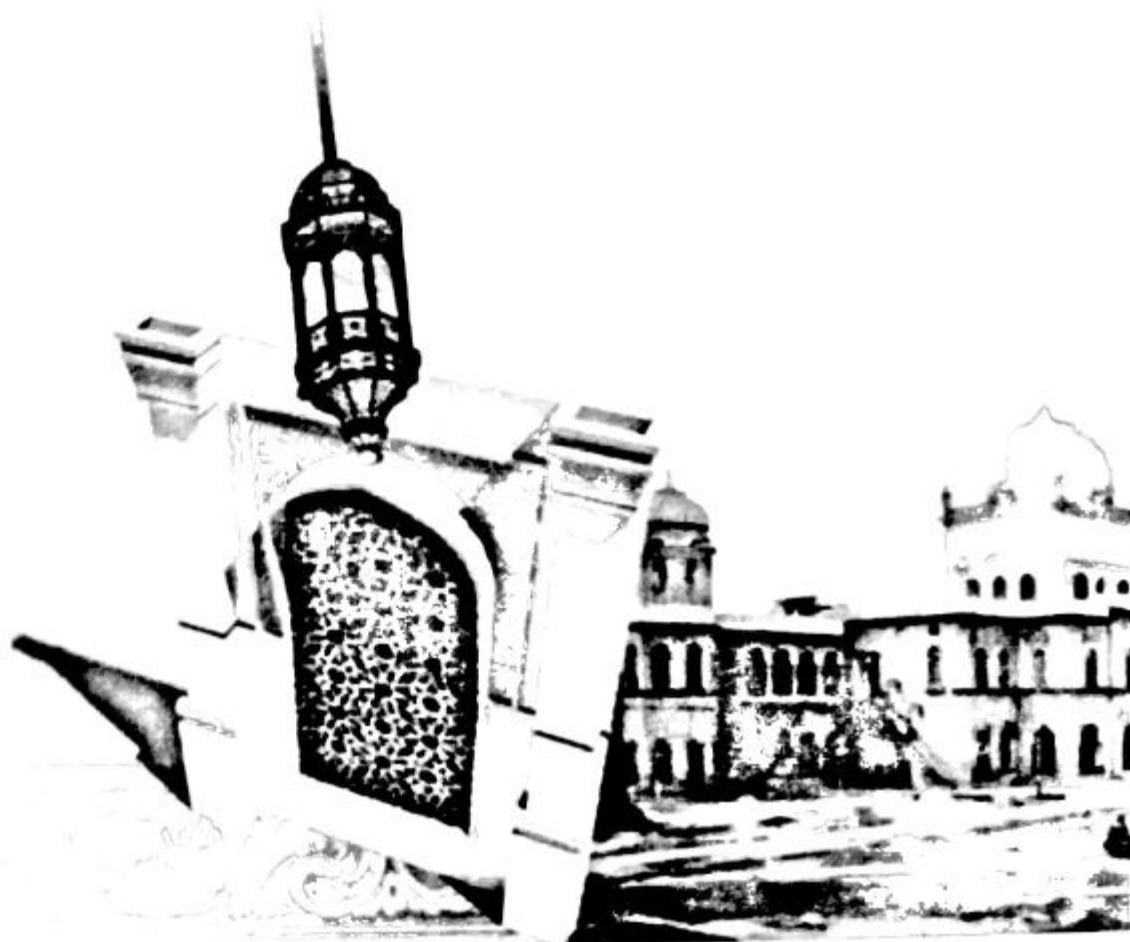
হাবিবুর রহমান আজমি রাহিমাহুল্লাহ

স্মৃতিচারণে

মাওলানা মুফতি আবুল কাসিম নোমানি

মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ, ইউ.পি. ভারত

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد:

হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি সাহেবের মৃত্যু আমাকে বেশ পেরেশান করে তুলেছিল। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে আমার পুরো মন ও মনন বিষাদে ভরে গিয়েছিল। তিনি যদিও বয়সের দিক থেকে আট দশক পার করেন; কিন্তু তাঁর চলাফেরার নিয়মতান্ত্রিকতা এবং সচেতনতা তাঁকে দুর্বল করতে পারেনি। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি কাজে সবসময় অনেক গোছালো ছিলেন। তাঁর পুরো জীবনটাই ছিল পরিপাটি। তিনি খুব সৌখিন চলাফেরা করতেন। আমি কখনও তাঁকে চিন্তিত কিংবা হতাশগ্রস্ত দেখিনি। এজন্যই মূলত তাঁর হঠাৎ করে চলে যাওয়া আমার এবং আমাদের অন্তরে বেশ দাগ কেটেছে।

যা কিছুই বলি না কেন; যিনি চলে যাওয়ার নির্ধারিত সময়ে এসে যান তাকে কি আর আটকে রাখা যায়? হাজারও শুভাকাঙ্ক্ষী ও হিতাকাঙ্ক্ষীকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি সাহেবের এভাবে চলে যাওয়া সত্যিই মেনে নিতে সবার জন্য কষ্ট হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা তার বিশেষ রহমতের চাদরে তাঁকে আবৃত করে রাখুন এবং তাঁর ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিন। তাঁর সব খেদমত কবুল করুন। তাঁর রেখে যাওয়া সব আমানতের হেফাজত করুন এবং দারুল উলুম দেওবন্দের যে শূন্যতা বিরাজ করছে তাঁর উত্তম বদলা দান করুন।

মৃত্যুর বেশ কয়েকদিন পর তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখছি। তাই বুঝতে পারছি না লেখাটা কোত্থেকে শুরু করব! মূলত হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক প্রায় তিন যুগ থেকে। প্রত্যেক যুগের পৃথক পৃথক অসংখ্য স্মৃতি আমার মাথায় কিলবিল করছে।

প্রথম যুগের গল্প

আমাদের মধ্যকার সম্পর্কের প্রথম যুগ ছিল ছাত্রজীবন। শাওয়াল ১৩৮৬ হিজরি মোতাবেক ১৯৬২ সালে এই অধম ইলম অন্বেষণের তীব্র পিপাসা নিয়ে দারুল উলুম দেওবন্দে এলাম। ভর্তির সব ঝক্কি-ঝামেলা শেষ করে যখন নিজেকে একটু অবসর করলাম, তখন নিজের পাড়া-প্রতিবেশী খুঁজতে থাকলাম।

আমার মেজাজ ছিল- আমি যতই দূরে পড়ালেখা করার জন্য যেতাম আমার প্রথম কাজ থাকত পাড়া-প্রতিবেশীদের খুঁজে বের করা। প্রথমে খুঁজতাম নিজের গ্রাম তারপর থানা তারপর জেলা এবং অন্তত প্রদেশের কাউকে পেলে নিজের অনেক আপন মনে হতো। এজন্য প্রায় ৯০০ কিলোমিটার দূরত্বের উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দাদেরও আমার আপন মনে হতো। আজমগড়, মোবারকপুর, মৌ এসব জেলা বানারসের একদম কাছাকাছি। এজন্যই মূলত এসব অঞ্চলের ছাত্রদের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্রদের থেকে একটু বেশি আপন মনে হতো।

ঠিক সেই সময় হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমিও দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্র ছিলেন। তাঁর কিছু গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি সবার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এমন কিছু কথা রয়েছে যা আমাকে বলতেই হবে ইনশাআল্লাহ! এসব বিষয়ে সামনে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

তাঁর একটি মহান কাজ

ঘটনা হলো– সেই সময় মোবারকপুর, ওলিদপুর, মৌ, খায়রাবাদ এসব জেলা আজমগড়ের অংশ ছিল। এদিকে আজমগড় এবং ওই অঞ্চলের ছাত্রদের মাঝে কিছুটা দ্বন্দ্ব ছিল। তা প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক এমনকি

হাতাহাতিতে রূপ নিয়ে নিতো। ফুলপুর, মুহাম্মদপুর, জাগদিশপুর এবং আজমগড় মিলে একটি অঞ্চল ছিল। অন্যদিকে মৌ এবং তার আশপাশের এলাকা নিয়ে একটি অঞ্চল ছিল। এই দুটি অংশের পৃথক পৃথক সংগঠন ছিল। হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি সাহেবের একটি মহান কাজ ছিল– তিনি এই দুটি সংগঠনকে ভেঙে একটি করেছেন এবং নাম দিয়েছেন- 'আঞ্জুমানে নাদিয়াতুল ইত্তেহাদ'। এই সংগঠনের অধীনে আজমগড়সহ সবাই একত্রিত হয়ে গেল। মনে পড়ছে, এই মহান কাজে তাঁর সাথে কারী হাম্মাদ আজমিও (বর্তমান দপ্তর সম্পাদক, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ) সঙ্গ দিয়েছিলেন। একই যুগ হলেও তাঁর এবং আমার মধ্যে জামাতের (ক্লাসের) বেশ দূরত্ব ছিল। কেননা তখন তিনি দাওরায়ে হাদিস পড়ছিলেন আর আমি কেবল কানযুদ-দাকায়েক (শরহেজামী জামাত) পড়ছিলাম। কিন্তু এই মহান কাজে তখন থেকেই তাঁর প্রতি অনেক আগ্রহী এবং আকৃষ্ট ছিলাম। অন্তরে জন্ম নিয়েছিল তাঁর প্রতি অনেক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা।

দ্বিতীয় যুগের ইতিহাস

এরপর মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি সাহেব পড়ালেখা সম্পন্ন করে নিজ এলাকায় চলে এলেন এবং নিজের কর্মজীবন শুরু করলেন। আমিও ১৩৮৮ হিজরিতে দারুল উলুম দেওবন্দের পড়ালেখা সম্পন্ন করে নিজ এলাকা বানারসে চলে এলাম। সেখানে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী দীনি বিদ্যাপীঠ জামিয়া ইসলামিয়া মদনপুরে আমার কর্মজীবনের সূচনা হলো। জামিয়া ইসলামিয়া বানারসের সদরুল মুদাররিস, আমার সম্মানিত উস্তাদ, হযরত মাওলানা ইদ্রিস সাহেব আজমগড়ের বাসিন্দা ছিলেন এবং ওই প্রতিষ্ঠানের একজন প্রাক্তন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি সাহেব জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়ায় শিক্ষক হিসেবে আমার আগেই আগমন করেন। আর সেখান থেকেই আমাদের মধ্যকার সম্পর্কের দ্বিতীয় যুগের সূচনা হয়। যেটা দারুল উলুম দেওবন্দ আসা পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই সময়ে খুব কাছ থেকে আমি মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি সাহেবের পাঠদান পদ্ধতি, ইলমি অবস্থান, তাঁর তাহকিক এবং বিভিন্ন লেখালেখি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

লেখালেখি ও রচনা

কয়েক বছর পর জামিয়া ইসলামিয়ার আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগকে মদনপুরা রোডের পুরাতন বিল্ডিং থেকে স্থানান্তরিত করে নতুন বিল্ডিং জামিয়া ইসলামিয়া ইউড়িতালাবে নিয়ে যাওয়া হয়। মওলানাও অন্যান্য উস্তাদদের সাথে সেখানে ছাত্রদের শিক্ষাদানে মগ্ন হয়ে যান। পাশাপাশি তাঁর গবেষণা, লেখালেখি এবং রচনার কাজ শুরু করে দেন। বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি হযরত শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব বানারসি রাহিমাহুল্লাহুর জীবনীর ওপর 'সাজারায়ে তায়্যিবাহ'র বিন্যস্তকরণ এবং আজমগড় জেলার মরহুম উলামায়ে কেরামের স্মৃতিচারণসমৃদ্ধ গ্রন্থ 'তাজকিরায়ে উলামায়ে আজামগড়' রচনা করেন।

তিনি তাঁর প্রতিটা মুহূর্তকে ইলম অন্বেষণের কাজে ব্যয় করতেন। কোনো একটি বিষয়কে ভাসা ভাসা জানাশোনাকে তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি যখন কোনো একটি বিষয়ের ওপর লেখার ইচ্ছা করতেন তখন এই বিষয়ের ওপর লিখিত অনেক পুরনো এবং সমসাময়িক বিভিন্ন লেখালেখি খুব মনযোগ সহকারে পড়তেন। এরপর যখন বিষয়টি সম্পর্কে পুরোপুরি পরিতৃপ্ত হতেন তখন সেটার সারাংশ খুবই সুন্দরভাবে, সরল শব্দের গাঁথুনি দ্বারা পাঠকের সামনে উপস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তিনি তাঁর এসব তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি করার জন্য বানারসের সুপ্রসিদ্ধ এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমে দীন হাকিম মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব বানারসির লাইব্রেরি থেকে বেশ উপকৃত হয়েছেন। জৌনপুরের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত পুরনো পাণ্ডুলিপিগুলো থেকেও তিনি বেশ কিছু তথ্য-উপাত্ত আহরণের চেষ্টা করেছেন। সেই সময়ে জামিয়া ইসলামিয়ার পড়ালেখার মান দিন দিন বেশ উন্নত হচ্ছিল। এজন্য জামিয়া ইসলামিয়ার সুনাম ও সুখ্যাতি সবার মাঝে বেশ সমাদৃত ছিল। এখনও জামিয়া ইসলামিয়া হাদিসের জামাত খোলা হয়নি। সব ছাত্রই মেশকাত জামাতের পড়ালেখা শেষ করে দারুল উলুম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদিস পড়ার জন্য চলে আসে। আলহামদুলিল্লাহ! সব ছাত্র ভর্তির সুযোগ পেয়ে যায়।

আজও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জামিয়া ইসলামিয়ার ফাজিলরা ইলমে নববির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। অসংখ্য-অগণিত উলামা ইতঃপূর্বে দীনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন।

সহপাঠী হওয়ার সৌভাগ্য

জামিয়া ইসলামিয়া ইউড়িতালাব বানারসে খেদমতে থাকাবস্থায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি রাহিমাহুল্লাহ থেকে শায়খ সাঈদ ইবনে সাম্ভল রাহিমাহুল্লাহুর রিসালা 'আল আওয়ায়িল' পড়ে তাঁর থেকে ইজাজত আনার জন্য আমরা উভয়ে পরামর্শ করলাম। এরপর মাওলানা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বানারসে এলেন এবং পিলিকুটি মহল্লায় মরহুম হাজী আব্দুল আজিজ সাহেবের বাসায় কিছুদিন অবস্থান করেন। এই ফাঁকে আমরা দুজন ইজাজত নেওয়ার জন্য সেই বাসায় গেলাম। আমি অধম পুরো রিসালা 'আল আওয়ায়িল' তাঁকে পড়ে শোনালাম। এরপর তিনি আমাদের দুজনকে এই রিসালা থেকে বর্ণনা করার অনুমতি দিলেন।

হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি সাহেব তাঁর একটি কিতাবে এই মজলিসের পরিপূর্ণ আলোচনা সন-তারিখসহ খুবই সুন্দরভাবে নিয়ে এসেছেন। যে কেউ তাঁর কিতাব পড়লে এ সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা জানতে পারবেন। আর এভাবেই মূলত আমরা দুজন পড়ালেখার ক্ষেত্রে সহপাঠী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি।

মূলত মাওলানা সম্পর্কে আমি যতই স্মৃতিচারণ করছি– অনেক নতুন নতুন স্মৃতিমালা আমার মাথায় কিলবিল করছে। কিন্তু লেখার কলেবর বড় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আমি এখানেই দ্বিতীয় যুগের গল্পগুলোর ইতি টানছি।

দারুল উলুম দেওবন্দের আরবি ভাষা ও সাাহিত্য বিভাগের প্রধান,
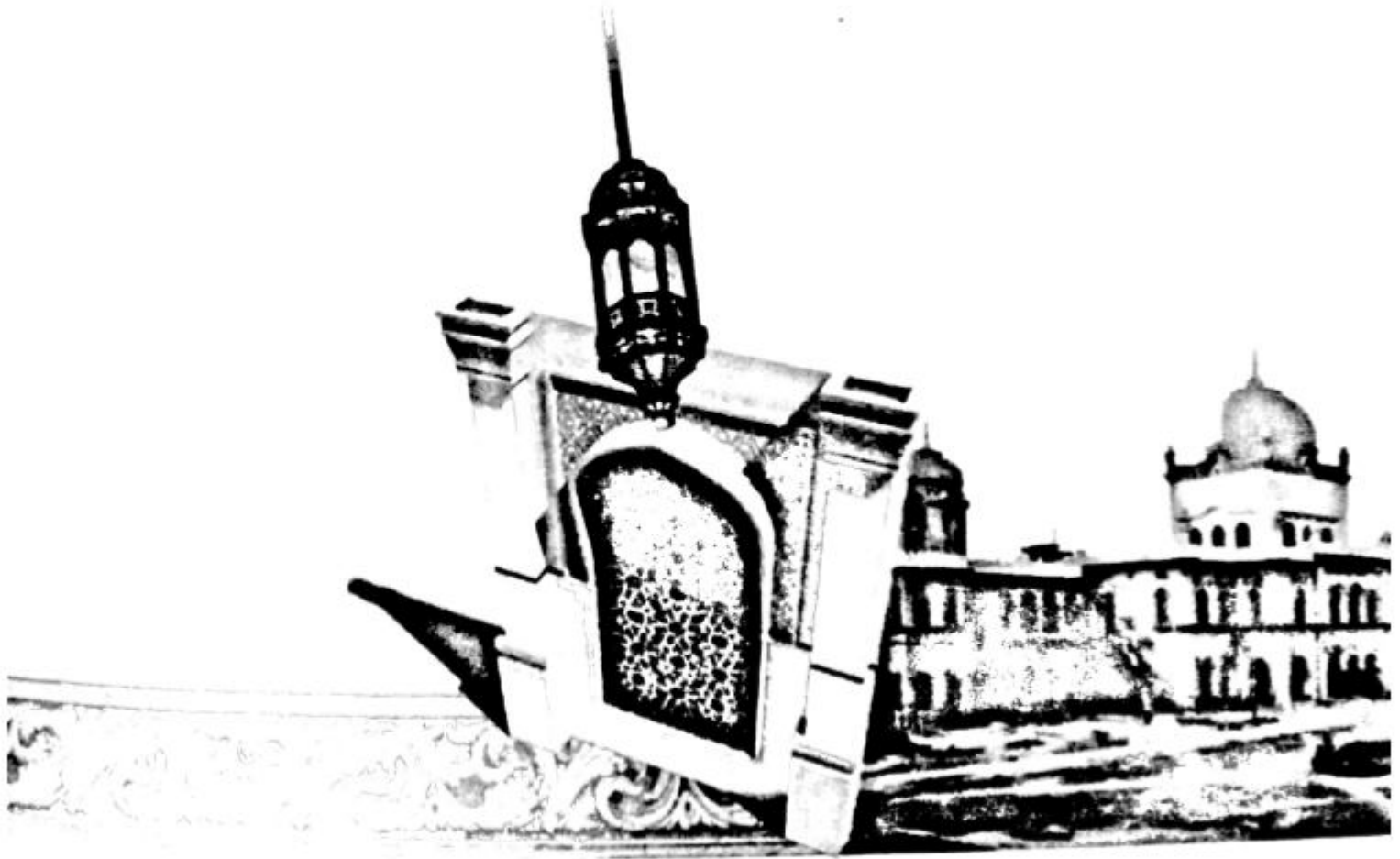
বহুগ্রন্থ প্রণেতা, হযরত মাওলানা

নুর আলম খলিল আমিনি রাহিমাহুল্লাহ

স্মৃতিচারণে

মাওলানা মুফতি আবুল কাসিম নোমানি

মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ, ইউ.পি. ভারত

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ﴾ ﴿اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ﴾

'যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সেসব লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত।[৩৬]

মৃত্যুর সংবাদ

২০শে রমজান সুবহে সাদিকের সময় হঠাৎ আমার কাছে সংবাদ এলো- দারুল উলুম দেওবন্দের সবার প্রিয় উস্তাদ, প্রখ্যাত আরবি সাহিত্যিক, আরবি ভাষার একজন সর্বজনস্বীকৃত দিকপাল, দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত মাসিক আদ-দাঈ পত্রিকার সম্মানিত সম্পাদক মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। আমি বিশ্বাস

৩৬. সুরা বাকারা: আয়াত ১৫৬-১৫৭

করি, কেবল শুধু আমি না, দারুল উলুম দেওবন্দের অন্যান্য উস্তাদবৃন্দ, তাঁর মুহিব্বিন, হিতাকাঙ্ক্ষী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং বিশেষত ছাত্ররা এই ইন্তেকালের সংবাদ শুনে স্বাভাবিকভাবেই ভালো থাকার কথা না। গেল বছরের ২৫শে রমজান, দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল হাদিস ও সদরুল মুদাররিসিন হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। এখনও দারুল উলুম দেওবন্দ এবং আমরা সে শোক কাটিয়ে উঠতে পারিনি; এরই মধ্যে এমন দুঃসংবাদ আমাদের অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি সাহেবকে আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন মনে করছি না; তিনি তাঁর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং কাজের দ্বারা সর্বমহলে পরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

দারুল উলুম দেওবন্দেই আমার শিক্ষা সমাপনী হয়েছে। ১৩৮৭-১৩৮৮ হিজরি ছিল আমার দারুল ইফতার বছর। এই বছর উস্তাদে মুহতারাম মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানভির কাছে প্রায় ৮০ জন ছাত্র আরবি বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য দরখাস্ত জমা দেন। মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানভি রাহিমাহুল্লাহ তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ৮০ জনকে দুই ভাগে ভাগ করলেন। প্রথম ৪০ জনকে হযরত নিজেই পড়াতেন এবং অপর ৪০ জনকে তাঁর ছাত্রদের মধ্য থেকে কোনো একজন হযরতের নেগরানিতে পড়ানো হতো।

আলহামদুলিল্লাহ! আমি বেশ সৌভাগ্যবান। এরকম একটি গ্রুপের জিম্মাদারি আমার ওপর সোপর্দ করা হয়েছিল। হাকিকি উস্তাদ হযরত মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানভি নিজেই ছিলেন; তবে তাঁর নেগরানি এবং সার্বিক দিকনির্দেশনায় আমি অধমও একটি সবক পড়াতাম।

আলহামদুলিল্লাহ! ওই ৪০ জন ছাত্রের মধ্যে হযরত মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনিও ছিলেন। তিনি নুর আলম মুজাফফরপুরি নামে

ওই বছর ভর্তি হয়েছিলেন। আমার ঠিক মনে পড়ছে না; সেটা তার আরবি ভাষার কোন বর্ষ ছিল। যদিও এটা আমার শিক্ষা সমাপনী বছর ছিল। আমি তাঁর পরবর্তী লেখাপড়া সম্পর্কে তেমন একটা অবহিত ছিলাম না। কিন্তু এই এক বছরের দেখা, তাঁর যোগ্যতা এবং লেখাপড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও উদ্দীপনা আমাকে যারপরনাই মুগ্ধ করেছে। তখন থেকেই আমার এই ধারণা হয়েছিল- তিনি একজন যোগ্য আলেম হয়ে লেখাপড়া সমাপ্ত করবেন।

মাওলানা এবং সহপাঠীরা

অত্যন্ত পরিষ্কার লেখা, গোছানো কথাবার্তা, সহজে যেকোনো কিছুর মূলকথাকে উপস্থাপনের যোগ্যতা ছিল তাঁর। ওই বছর সেই জামাতে যে কজন ছাত্র ছিল এর মধ্য থেকে মাওলানা নুর আলম খলিলি আমিনি ছাড়াও মাওলানা নেছার আহমাদ বাস্তাবি; (যিনি কয়েক মাস পূর্বে দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল হাদিস এবং সদরুল মুদাররিসিন ছিলেন, এখন তিনি ইন্তেকাল করেছেন) মাওলানা ইবাদুর রহমান সাহেব বুলন্দশহরি; (সাবেক উস্তাদ, মাদরাসায়ে খাদিমুল ইসলাম হাঁপুড়) হাকিম জহির আহমাদ সাহেব ফায়জাবাদি; (সাবেক উস্তাদ, জামিয়া তিব্বিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ) মাওলানা নিয়াজ আহমাদ ফারুকি; (দপ্তর সম্পাদক জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলহামদুলিল্লাহ! তাদের কেউ না কেউ ভবিষ্যতে ভালো দায়িত্বে সমাসীন হয়েছেন।

এদিকে আমি দারুল উলুম দেওবন্দের দায়িত্বে আসার পর এখানকার সব শিক্ষক, বিশেষত যারা উপরের জামাতগুলোতে পড়ান; তাদের সঙ্গে আমার বারবার বসা হয়েছে। মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনিও প্রায় সবকটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! প্রত্যেকটি বৈঠকেই তাঁর সুচিন্তিত মতামত এবং সার্বিক পরামর্শ আমাকে অনেক সহায়তা করেছে।

মাওলানার বৈশিষ্ট্য

তাঁর এমন কিছু গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল, যা সর্বমহলে বেশ সমাদৃত ছিল। এর মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর বেশ জ্ঞান রাখতেন। আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অনেক গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সাহিত্যমানসম্পন্ন লেখা পাঠকদের বেশ আকৃষ্ট করত। তিনি বেশ কিছু কিতাবাদি উর্দু থেকে আরবি ভাষায় রূপান্তর করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে– বেশ কিছু আকাবিরের জীবনী। তাঁর লেখা পড়লে মনে হতো না তিনি অন্য কোনো ভাষা থেকে তা আরবিতে রূপান্তর করেছেন। তাঁর লেখালেখির স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল খুবই অভিনব। যেকোনো লেখা পড়লেই মনে হতো তিনি তাঁর নিজের মতো করেই লিখেছেন। বিশেষত তাঁর উর্দু থেকে অনূদিত আরবি কিতাবগুলো পড়লে মনে হয় না তা অনুবাদ। যে কেউ পড়লেই ধারণা করতো এটা তাঁর নিজস্ব কোনো রচনা।

আদ-দাঈ পত্রিকার একাডেমিক এবং পশ্চিমা বিশ্বসংক্রান্ত বিষয়ের ওপর লিখিত তাঁর রচনাগুলো আরবি এবং অনারবি সবধরনের পাঠককে বেশ মুগ্ধ করত।

আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর দক্ষতা

আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর লেখালেখি এবং তাঁর বই-পুস্তক আমাদেরকে বারবার তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এতক্ষণ তো কেবল তাঁর আরবি ভাষা ও সাহিত্যের দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। খুব কম মানুষই পাওয়া যায় যাদের মধ্যে একসঙ্গে দুটি ভাষা লেখার ও বলার সমানভাবে দক্ষতা রয়েছে। আরবি ভাষায় তাঁর যেসব খেদমত রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সম্পর্কে মোটামুটি সবাই অবগত। আরবি ভাষার পাশাপাশি তিনি উর্দু ভাষায়ও বেশ দক্ষ ছিলেন। আরবি সাহিত্য এবং উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের প্রত্যেকটি নিয়ম-কানুন তাঁর বেশ ভালোভাবে জানা-শোনা ছিল। শব্দচয়ন, বাক্যগঠন এবং সুখপাঠ্য করে উপস্থাপনার চমৎকার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন অন্যান্য লেখকদের থেকে অনন্য ও ভিন্ন। আরবি গদ্য সাহিত্যের নিয়ম-কানুনের ওপর তাঁর বইপত্রও রয়েছে।

দারুল উলুম দেওবন্দের তথ্য-গবেষণা এবং রচনা বিভাগের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য উস্তাদের সাথে দারুল উলুম দেওবন্দের মেহমানখানায় কিছুদিন আগে একটি মিটিং হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই বিভাগে যারা কাজ করবেন; কাজ শুরু করার আগে তাদের সঙ্গে সামান্য আলোচনা-পর্যালোচনা করা। এই মিটিংয়ে মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি এবং হযরত মাওলানা মুফতি আমিন সাহেব পালনপুরিকে রচনা সম্পর্কিত প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সকল ব্যবস্থাপনার এবং কাজের একটা নকশা প্রণয়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

আত্মমর্যাদাবোধ ও সৌখিনতা

মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল- আত্মমর্যাদাবোধ ও সৌখিনতা। মাওলানাকে আমি আমার এই ১০ বছরের সময়কালে কখনও অপরিপূর্ণ পোশাকে দেখিনি। আভিজাত্যপূর্ণ জামা-শেরওয়ানি এবং সবসময় হাসিখুশি অবস্থায় বিভিন্ন বৈঠকে উপস্থিত হতে দেখেছি। আমি আরেকটি জিনিস খুবই লক্ষ্য করেছি– যখনই অফিসে কোনো বৈঠকের আয়োজন করা হতো, বৈঠকের যে সময় নির্ধারণ করা হতো ঠিক সেই সময়েই তিনি উপস্থিত হতেন। সময়ের প্রতি বেশ যত্নবান ছিলেন তিনি। তিনি ছাড়াও মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ আজমি সাহেবও প্রতিটি বৈঠকে যথাসময়ে উপস্থিত হতেন। তিনিও মাশাআল্লাহ সময়ের প্রতি বেশ গুরুত্ব দিতেন। একদিনের ঘটনা– মাওলানা মুজিবুল্লাহ গন্ডবি সাহেবের সন্তান কানপুরে ইন্তেকাল করেন, তার লাশ সেখান থেকে নিয়ে আসা হচ্ছিল। তখন দারুল উলুম দেওবন্দের সকল উস্তাদ আফ্রিকি মনজিলের পাশে তার বাসায় একত্রিত হয়েছিলেন। ওইদিন মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি শুধু একটি পাজামা-কুর্তা এবং একটি টুপি পরে এসেছিলেন। এই একটি মাত্র দিন ছাড়া আমার আর স্মরণ হচ্ছে না (চাই সেটা কোনো বৈঠক হোক; দরস কিংবা কোনো সফর; অথবা শীতকাল হোক আর গ্রীষ্মকাল) তিনি তাঁর সৌখিন ও নির্দিষ্ট সজ্জিত পোশাক ছাড়া কখনও বের হয়েছেন বলে মনে পড়ে না।

কথা বলার ধরন

তাঁর কথা বলার ধরন ছিল একটু ভিন্নরকম। সবসময় থেমে থেমে কথা বলতেন। অনর্থক কথাবার্তা বলা থেকে সবসময় নিজেকে বিরত রাখতেন। যেকোনো বিষয়ে অনর্থক কথা বলাকে তিনি কখনও পছন্দ করতেন না। আলহামদুলিল্লাহ! একাডেমিকভাবে তিনি তাঁর প্রত্যেকটি ছাত্রকেও এভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আর এখন তো তাঁর ছাত্রের সংখ্যাও কম না। অসংখ্য-অগণিত। প্রত্যেক ছাত্রই তাঁর মতো প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী। তাঁর অনেক ছাত্র রয়েছেন যারা আরবি ভাষা ও সাহিত্যে সুনামের সাথে বেশ পাণ্ডিত্যের সাক্ষর রেখে চলেছেন। যেমনিভাবে হযরত মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানভি তার কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একদল ছাত্র রেখে গিয়েছেন, যাদের অন্যতম হলেন স্বয়ং মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি, ঠিক তেমনিভাবে মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনিও আরবি ভাষা ও সাহিত্যে একদল ছাত্র তৈরি করে গিয়েছেন। আশা করি আরবি ভাষা ও সাহিত্যে তারা আগামীর নেতৃত্ব দেবে ইনশাআল্লাহ। এখনই তারা বিভিন্ন মাদরাসার আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি লিখনি ও বয়ানের মাধ্যমে আরবি ভাষার গুরুত্বপূর্ণ মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

তাঁর কিছু অমর কর্ম

মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি আরবি লেখালেখির পাশাপাশি বিভিন্ন দুর্বোধ্য বিষয়ের ওপর বেশ কিছু কাজ করেছেন। বিশেষত ফিলিস্তিনের ওপর তাঁর একটি বৃহৎ গ্রন্থ রয়েছে; যা যুগ যুগ ধরে তাঁকে পাঠকের মাঝে অমর করে রাখবে। এছাড়াও আরবি লেখার সার্বিক নিয়ম-কানুনের ওপর তিনি যথেষ্ট কাজ করেছেন। আরবি লেখার পদ্ধতি; পাশাপাশি প্রত্যেক খত্তে দেওয়ানি এবং খত্তে রুকআ সম্পর্কেও তিনি বেশ কিছু দিকনির্দেশনামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রত্যেকটি কাজের উত্তম বদলা দান করুন।

প্রত্যেকটি কাজকে তাঁর জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন। আল্লাহ তায়ালা দারুল উলুম-এর জন্য তাঁর শূন্যতার উত্তম বদলা দান করুন। তাঁর সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, ছাত্রবৃন্দ এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সবরে জামিল দান করুন। আমাদের প্রত্যেককেই এই

দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে; কেউই এই পৃথিবীতে স্থায়ী না। কিন্তু কিছু লোক এমন যাদের চলে যাওয়া মেনে নিতে খুব কষ্ট হয়। আল্লাহ তায়ালা দারুল উলুম দেওবন্দকে হেফাজত করুন।

দারুল উলুমের কিছু মহান ব্যক্তিত্বের ইন্তেকাল

বছর-দুয়েকের মধ্যেই দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম সারির বেশ কজন মহারথি মুহাদ্দিস আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। হযরত মাওলানা রিয়াসত আলি বিজনুরি রাহিমাহুল্লাহ, হযরত মাওলানা আব্দুল হক আজমি রাহিমাহুল্লাহ, হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ, হযরত মাওলানা জামিল আহমাদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহ, আর এখন মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনিও আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে অনন্তের পথে যাত্রা করলেন। তাঁরা ছাড়াও আরও কয়েকজন মহারথি আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে কবরবাসী হয়েছেন; যাদের নাম এখন আমার মাথায় আসছে না। এটা ইলমে নববির জন্য নিঃসন্দেহে একটি সংকট। হাদিসের মধ্যেও এরশাদ হয়েছে– আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন আলেমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ইলমকে আমাদের থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন।

এমন মহাসংকটকালে আল্লাহ পাক উম্মাহর প্রতি অনুগ্রহ করুন। এই সময়ে পুরো মুসলিম উম্মাহ বিশেষত– হিন্দুস্তান যে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া আমাদের জন্য খুবই কঠিন ব্যাপার। আল্লাহ তায়ালা এই মহামারি থেকে আমাদেরকে এবং পুরো মুসলিম উম্মাহকে হেফাজত করুন। আমি আলোচনার শেষ প্রান্তে এসেছি– মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি রাহিমাহুল্লাহুর সন্তান-সন্ততি আত্মীয়-স্বজন এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আফসোস করছি; ঠিক এই সময় আমি দারুল উলুম দেওবন্দ যেতে পারছি না; এই করোনা মহামারির কারণে আমি নিজ এলাকাতেই অবস্থান করছি। যখন এই কথাগুলো বলছি; সম্ভবত এখন তাঁর লাশ দাফন-কাফন হয়ে গিয়েছে। ভাগ্য খারাপ! আমি তাঁর কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করতে পারলাম না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন এবং তাঁর সাথে রহমত মাগফেরাত এবং নাজাতের মুয়ামালা করুন।

দারুল উলুম দেওবন্দের সদ্য চলে যাওয়া
পাঁচজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের

সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রহ.

মাওলানা কারী সায়্যিদ মুহাম্মদ উসমান মানসুরপুরি রহ.

মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি রহ.

মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি রহ.

মাওলানা আব্দুল খালিক সাম্ভলি রহ.

দারুল উলুম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসিন ও শায়খুল হাদিস,
বহু গ্রন্থ প্রণেতা, সাঈদে মিল্লাত, হযরত মাওলানা

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ

জন্ম ও জন্মস্থান

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর জন্ম তারিখ সংরক্ষিত নেই। হ্যাঁ, যখন তাঁর বয়স দেড় বা পৌনে দুই বছর তখন তাঁর সম্মানিত পিতা জন্মস্থান ডিবহাডের একটি জমি কিনেছিলেন, এর দলিলপত্র এখনও বিদ্যমান আছে। সে হিসেবে তাঁর সম্মানিত পিতা অনুমান করেন, তাঁর জন্ম ১৯৫০ সালে। তিনি কালিড়া নামক স্থান এবং জেলা বানাস কাঁঠায় (উত্তর গুজরাট) জন্মগ্রহণ করেন। এই জেলারই কেন্দ্রীয় শহর হলো পালনপুর; যা ভারত স্বাধীনের আগে মুসলমান নবাবদের স্টেট ছিল। সেখানে একটি আরবি মাদরাসা সুল্লামুল উলুম নামে প্রতিষ্ঠিত হয়; যেখানে মাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠদান করা হয়।

নাম ও উপনাম

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর মা-বাব তাঁর নাম শুধু আহমাদ রেখেছিলেন। কেননা– তাঁর একজন বড় মা-শরিক ভাই ছিলেন আহমাদ নামে। তারই স্মরণে সম্মানিত মাতা তাঁর নাম রাখেন আহমদ। সাঈদ আহমাদ নামটি তিনি নিজেই রেখেছিলেন। যখন সাহারানপুর মাজাহিরুল উলুম মাদরাসায় ভর্তি হন সে সময় থেকে এই নামেই তিনি বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরিবারের বয়স্ক বৃদ্ধরা এখনও তাঁকে আহমাদ ভাই নামেই ডাকেন। যদিও এখন এমন বৃদ্ধ দু'চারজনই কেবল বাকি আছেন।

তাঁর সম্মানিত পিতার নাম ইউসুফ। দাদার নাম আলি। যাকে সম্মানস্বরূপ 'আলি জি' বলা হতো।

শিক্ষাজীবনের সূচনা

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর বয়স যখন ৫/৬ বছর তখন তাঁর বাবা যিনি ডিবহাডে কৃষিকাজ করতেন, তাঁর শিক্ষাদীক্ষার সূচনা করেন। কিন্তু সম্মানিত পিতা ক্ষেত-বাড়ির কাজের কারণে তাঁর দিকে পুরোপুরি নজর রাখতে পারেননি। এজন্য তাঁকে নিজ জন্মস্থান কালিড়ায় মক্তবে ভর্তি করিয়ে দেন।

শৈশবের উস্তাদগণ

তাঁর মক্তবের উস্তাদরা হলেন–

১. *মাওলানা দাউদ সাহেব চৌধুরি রাহিমাহুল্লাহ*

২. *মাওলানা হাবিবুল্লাহ সাহেব চৌধুরি রাহিমাহুল্লাহ*

৩. *মাওলানা ইবরাহিম সাহেব জোনকিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ*

প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে নিজের মামা মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর সাথে ছাপি গমন করেন এবং দারুল উলুম ছাপিতে মামাসহ অন্যান্য শিক্ষকদের কাছ থেকে ফারসির প্রাথমিক কিতাবাদি ছয় মাস পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ছয় মাস পর মামা দারুল উলুম ছাপি ছেড়ে নিজের বাড়ি ফিরে এলে তিনিও তার সাথে জোনি সিদ্ধনিতে চলে আসেন এবং ছয় মাস পর্যন্ত তার কাছে ফারসির কিতাবাদির পাঠ গ্রহণ করেন। এরপর মুসলিহে উম্মাহ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ নজির মিয়া সাহেব পালনপুরির মাদরাসায় (যা পালনপুর শহরেই অবস্থিত) ভর্তি হন এবং চার বছর পর্যন্ত হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আকবর মিয়া সাহেব পালনপুরি এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাশেম সাহেব বুখারি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে আরবির প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক কিতাবগুলোর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

মুসলিহে উম্মাহ, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নজির মিয়া সাহেব এমন মহান ব্যক্তিত্ব যিনি এই শেষ যুগেও মানুষদের বিদআত, কুসংস্কার এবং সবধরনের অনৈসলামিক রীতিনীতি থেকে সরিয়ে হেদায়াত ও সুন্নাতের রাজপথে জড়ো করেন। আজও পালনপুর এলাকায় দীনি যে পরিবেশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তা মাওলানারই খেদমতের ফলাফল।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আকবর মিয়া সাহেব রাহিমাহুল্লাহ তার ছোটভাই এবং ডান হাত ছিলেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাশেম সাহেব বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বুখারা থেকে দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষা লাভের জন্য এসেছিলেন। দাওরায়ে হাদিস পাসের পর প্রথমে পালনপুরে, পরে ইমদাদুল উলুম গুজরাটে, এরপর জামেয়া হুসাইনিয়া রান্দিরে (সুরত), সবশেষে দারুল উলুম দেওবন্দে পাঠদানের খেদমত আঞ্জাম দেন। শেষ দিকে তিনি হিজরত করে মদিনা মুনাওয়ারায় চলে যান এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তিনি জান্নাতুল বাকিতে শায়িত আছেন।

মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুরে ভর্তি

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ পালনপুরে শরহে জামি পর্যন্ত পড়াশোনার পর উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে ১৩৭৭ হিজরি সনে সাহারানপুর (ইউ.পি.) সফর করেন এবং সেখানে ভর্তি হয়ে তিন বছর পর্যন্ত ইমামুন নাহু ওয়াল মানতিক, হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমাদ সাহেব জমোভি রাহিমাহুল্লাহর কাছে নাহু, মানতিক ও ফালসাফার বেশির ভাগ কিতাব পড়েন। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়ামিন সাহেব সাহারানপুরি, হযরত মাওলানা মুফতি ইয়াহয়া সাহেব সাহারানপুরি, হযরত মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেব রায়পুরি এবং হযরত মাওলানা ওয়াকার আলি সাহেব বিজনুরি রাহিমাহুমুল্লাহুর কাছেও বিভিন্ন কিতাব পড়েন।

দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষাজীবনের শুরু

এরপর তিনি ফিকহ, হাদিস, তাফসির এবং বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ১৩৮০ হিজরি সনে দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। প্রথম বছরে

হযরত মাওলানা নাসির আহমাদ খান সাহেব বুলন্দশহরি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে তাফসিরে জালালাইন (আলফাউজুল কবিরের সাথে), হযরত মাওলানা সায়্যিদ আখতার হুসাইন সাহেব দেওবন্দি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে হিদায়া প্রথম দুই খণ্ড এবং হযরত মাওলানা বশির আহমাদ খান সাহেব বুলন্দশহরি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে তাসরিহ-বসতে বাব, শরহে চোগমেনি, রিসালায়ে ফতহিয়া এবং রিসালায়ে শামসিয়া ইত্যাদি ইলমে হাইয়াতের কিতাবসমূহ পড়েন। পরের বছর মিশকাত শরিফ; হেদায়া আখিরাইন; তাফসিরে বাইজাবি ইত্যাদি কিতাব পড়েন এবং ১৩৮২ হিজরি সনে, দারুল উলুম দেওবন্দের শতবার্ষিকীর বছর দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন।

দেওবন্দের শিক্ষকবৃন্দ

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ দারুল উলুম দেওবন্দে যেসব আসাতিজায়ে কেরাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তারা হলেন- হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আখতার হুসাইন সাহেব দেওবন্দি, হযরত মাওলানা বশির আহমাদ খান সাহেব বুলন্দশহরি, হযরত মাওলানা সাঈদ হাসান সাহেব দেওবন্দি, হযরত মাওলানা আবদুল জলিল সাহেব কিরানভি, হযরত মাওলানা আসলামুল হক সাহেব আজমি, হাকিমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তায়্যিব সাহেব দেওবন্দি, হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান সাহেব মুরাদাবাদি, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাহুর সাহেব দেওবন্দি, ফখরুল মুহাদ্দিসিন মাওলানা ফখরুদ্দিন আহমাদ মুরাদাবাদি, ইমামুল মাকুল ওয়াল মানকুল আল্লামা মুহাম্মদ ইবরাহিম বিলয়াভি, মুফতিয়ে আজম হযরত মাওলানা মুফতি সায়্যিদ মাহদি হাসান সাহেব শাহজাহানপুরি, শাইখ মাহমুদ আবদুল ওয়াহহাব মাহমুদ সাহেব মিশরি এবং হযরত মাওলানা নাসির আহমাদ খান সাহেব বুলন্দশহরি রাহিমাহুমুল্লাহ।

পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন

তিনি বাল্যকাল থেকেই ছিলেন প্রখর মেধাবী। নিমগ্ন পড়াশোনা এবং পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন। পাশাপাশি উল্লিখিত আসাতিজায়ে কেরামের প্রচেষ্টা তাঁর যোগ্যতাকে ২২ বছর বয়সে চূড়ান্তে পৌছিয়ে দেয়। দারুল উলুম দেওবন্দের মতো বিরাট বিদ্যাপীঠে বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অর্জন করেন।

দারুল ইফতায় ভর্তি

তিনি দাওরায়ে হাদিস শেষ করে শাওয়াল ১৩৮২ হিজরি সনে তাকমিলে ইফতায় আবেদন করলে তা মঞ্জুর হয়। হযরত মুফতি সায়্যিদ মাহদি হাসান সাহেব শাহজাহানপুরির তত্ত্বাবধানে ফাতাওয়ার কিতাবাদি মুতালায়া এবং ফতোয়া প্রদানের অনুশীলনের সূচনা করেন। তিনি নিজ ভাই-বোনদের মাঝে সবচেয়ে বড় ছিলেন। এজন্য দাওরায়ে হাদিস থেকে ফারেগ হওয়ার পর নিজের ভাইদের শিক্ষা-দীক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। ১৩৮২ হিজরি সনে তিনি শাইখ মাহমুদ আবদুল ওয়াহহাব মাহমুদ মিসরি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে কুরআনে কারিম মুখস্থ করেন।

আরও কিছু কথা

১৩৮২-১৩৮৩ হিজরি সনে তিনি একদিকে ফতোয়ার কিতাব মুতালায়া করতেন, অন্যদিকে ভাইকে কুরআন মুখস্থ করাতেন। সঙ্গে নিজেও কুরআন মুখস্থ করতেন। এ কাজে তিনি এতোটাই ব্যস্ত ও মগ্ন থাকতেন যে, রমজানুল মোবারকেও বাড়ি যাননি।

এদিকে ইফতা কর্তৃপক্ষ তিনি যেন পুরোপুরি যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন সেজন্য দারুল ইফতায় ভর্তিতে আরও এক বছরের সুযোগ করে দেয়। সুতরাং ১৪৮৩-৮৪ হিজরিতে তিনি ছোটভাই মৌলভি আবদুল মাজিদ সাহেবকে ফারসির কিতাবগুলো পড়াতেন, অন্যদিকে ফতোয়া অনুশীলন করতেন। তিনি ফতোয়া প্রদানে এতোটা যোগ্যতা রাখতেন যে, ছয় মাস পর দারুল উলুম দেওবন্দের পরিচালনা কমিটি তাঁকে সহকারী মুফতির মর্যাদায় দারুল উলুম দেওবন্দে নিয়োগ দিয়ে দেয়।

প্রথম বাড়িতে ফেরা

২১শে শাওয়াল ১৩৮৪ হিজরি সনে তিনি মাদারে ইলমি দারুল উলুম দেওবন্দকে বিদায় জানিয়ে প্রথমে নিজের বাড়িতে যান। এক সপ্তাহ

বাড়িতে থেকে মা-বাবার জিয়ারতে ধন্য হন। এরপর ছোট তিন ভাইকে সঙ্গে নিয়ে রান্দির (সুরত) তাশরিফ নেন এবং দারুল উলুম আশরাফিয়ায় পাঠদানের সূচনা করেন।

কর্মজীবনের সূচনা

তিনি জিলকদ ১৩৮৪ হিজরি থেকে শাবান ১৩৯৩ হিজরি পর্যন্ত নয় বছর দারুল উলুম আশরাফিয়ায় আবু দাউদ শরিফ, তিরমিজি শরিফ, তাহাবি শরিফ, আশশামায়িল, মুয়াত্তাইন, নাসাই শরিফ, ইবনে মাজাহ শরিফ, মিশকাত শরিফ, (আলফাওজুল কাবিরসহ), তরজমায়ে কুরআন, হেদায়া আখিরাইন, শরহুল আকাইদুন নাসাফিয়াহ, হুসামি ইত্যাদি কিতাব দরস দেন। পাশাপাশি লেখালেখির ময়দানেও ব্যস্ত থাকেন। এই সময়েই তিনি 'দাড়হি আওর আম্বিয়া কি সুন্নাতে', 'হুরমাতে মুসাহারাত' এবং 'আলআওনুল কাবির' রচনা করেন। সে সময়ই তিনি কাসেমুল উলুমি ওয়াল খাইরাত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানুতভি রাহিমাহুল্লাহুর কিতাবসমূহ ও তার উলুম-মাআরিফের ব্যাখ্যা ও সহজীকরণ কাজের সূচনা করেন। 'ইফাদাতে নানুতাভি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে 'আল ফুরকান লাখনো'-তে প্রকাশিত হয়। যা ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। (কিন্তু এর কাজ আর সামনে অগ্রসর হয়নি, তিনি অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।)

দারুল উলুম দেওবন্দে নিয়োগ

তাঁর উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাশেম সাহেব বুখারি রাহিমাহুল্লাহ, যিনি প্রথমে জামিয়া হুসাইনিয়া রান্দিরে পড়াতেন; অবশেষে দারুল উলুম দেওবন্দে তাঁর নিয়োগ হয়। তিনি চিঠির মাধ্যমে সাঈদ আহমাদ পালনপুরিকে জানালেন যে, দারুল উলুম দেওবন্দে একজন শিক্ষকের জায়গা শূন্য আছে, অতএব আপনি শিক্ষকতার আবেদন পাঠিয়ে দিন। তিনি হযরত মাওলানা হাকিম মুহাম্মদ সাদ রশিদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর সঙ্গে পরামর্শক্রমে আবেদন করেন। এদিকে এ বছরই শাবানে মজলিসে শুরার বৈঠকে আরবি বিভাগের জন্য একজন শিক্ষক নিয়োগের আলোচনা এলে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনজুর নোমানি সাহেব রাহিমাহুল্লাহ তাঁর নামই প্রস্তাব করলেন। এই মজলিসেই তাঁর নিয়োগ সম্পন্ন হয়। তাঁকে শাবানেই এ বিষয়ে জানানো হয়। রমজানুল মোবারকের পর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে তাশরিফ আনেন। সে সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দারুল দেওবন্দে পাঠদানের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

দারুল উলুম দেওবন্দে পাঠদানের খেদমত

তিনি শাওয়াল ১৩৯৩ হিজরি থেকে দারুল উলুম দেওবন্দে যেসব কিতাব পড়িয়েছেন এর বিস্তারিত বিবরণ সন আকারে নিম্নে দেয়া হলো–

১৩৯৩-৯৪ হিজরি: মুসাল্লামুস সুবুত, হিদায়া প্রথম খণ্ড, সুল্লামুল উলুম, হাদিয়ায়ে সাইদিয়া, জালালাইন (প্রথম অর্ধেক) আলফাওজুল কাবিরসহ, মুল্লা হাসান।

১৩৯৪-৯৫ হিজরি: মুসাল্লামুস সুবুত, শরহুল আকায়িদে নাসাফি, মুল্লা হাসান, জালালাইন (২য় অর্ধেক) আলফাওজুল কাবির।

১৩৯৫-৯৬ হিজরি: মুসামারাহ, দিওয়ানে মুতানাব্বি, মাইবুজি, তাফসিরে বাইজাবি ২১-২৫তম পারা।

১৩৯৬-৯৭ হিজরি: দিওয়ানে মুতানাব্বি, তাফসিরে বাইজাবি ২৬-৩০তম পারা, মোল্লা হাসান ও মিশকাতুল মাসাবিহ (সাময়িক)।

১৩৯৭-৯৮ হিজরি: মিশকাতুল মাসাবিহ দ্বিতীয় খণ্ড, নুখবাতু ফিকারসহ, হুসামি (কিয়াস অধ্যায়) মোল্লা হাসান, সাবয়ে মুআল্লাকা, হিদায়া, মুয়াত্তা লিল ইমাম মালেক।

১৩৯৮-৯৯ হিজরি: দিওয়ানে হামাসা, সাবয়ে মুআল্লাকা, তাফসিরে বাইজাবি সুরা বাকারা, মিশকাতুল মাসাবিহ (২য় খণ্ড) নুখবাতু ফিকারসহ, তাফসিরে মাজহারি ১৬-২০তম পারা, মুয়াত্তা লিল ইমাম মালেক, সিরাজি ও নাসাই শরিফ।

১৪০০ হিজরি: মিশকাতুল মাসাবিহ (২য় খণ্ড) নুখবাতু ফিকারসহ, তাফসিরে বাইযাজি। ২১-২৫ পারা, দিওয়ানে হামাসা, সাবয়ে মুআল্লাকা, মুয়াত্তা লিল ইমাম মালেক, সিরাজি।

১৪০১ হিজরি: মিশকাতুল মাসাবিহ (২য় খণ্ড) নুখবাতু ফিকারসহ, তাফসিরে বাইজাবি ২৬-৩০ পারা, তাফসিরে মাদারিকুত তানজিল ৬-১০, সিরাজি, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ।

১৪০২ হিজরি: সুনানে তিরমিজি (১ম খণ্ড) তাফসিরে বাইজাবি বাকারা, সুনানে আবু দাউদ, সহিহ বুখারি সানি, মুয়াত্তা মালেক ও মুয়াত্তা মুহাম্মাদ।

১৪০৩ হিজরি: সুনানে তিরমিজি (১ম খণ্ড) তাফসিরে বাইজাবি বাকারা, সহিহ মুসলিম (১ম খণ্ড) মুকাদ্দিমাতুবনিস সালাহ, রশিদিয়া, সুনানে ইবনে মাজাহ।

১৪০৪ হিজরি: সুনানে তিরমিজি (১ম খণ্ড) তাফসিরে বাইজাবি (বাকারা) হিদায়া চতুর্থ খণ্ড ও তাহাবি শরিফ।

১৪০৫ হিজরি: সুনানে তিরমিজি ১ম খণ্ড, তাফসিরে বাইজাবি (বাকারা) হিদায়া তৃতীয় খণ্ড, বুখারি ১ম খণ্ড ও তাহাবি শরিফ।

১৪০৬ হিজরি: সুনানে তিরমিজি ১ম খণ্ড, তাফসিরুল কুরআন, হিদায়া চতুর্থ খণ্ড ও তাহাবি শরিফ।

১৪০৭ হিজরি: তালখিসুল ইতকান, সুনানে তিরমিজি ১ম খণ্ড, তাফসিরুল কুরআন, হিদায়া চতুর্থ খণ্ড ও তাহাবি শরিফ।

১৪০৮ হিজরি: তিরমিজি ১ম খণ্ড, তাফসিরুল কুরআন, হিদায়া চতুর্থ খণ্ড, তাহাবি শরিফ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা।

১৪০৯ হিজরি: তিরমিজি ১ম খণ্ড, তাফসিরুল কুরআন, হিদায়া চতুর্থ খণ্ড, তাহাবি শরিফ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ।

১৪১০ হিজরি: তিরমিজি ১ম খণ্ড, তাফসিরুল কুরআন, হিদায়া তৃতীয় খণ্ড, তাহাবি শরিফ।

১৪১১ হিজরি থেকে ১৪২৭ হিজরি পর্যন্ত তিরমিজি ১ম খণ্ড, তাহাবি শরিফ এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার পাঠদান করেছেন।

১৪২৭ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সহিহ বুখারি ১ম খণ্ডের দরস প্রদান করেন।

তাঁর অন্যান্য খেদমত

উল্লিখিত পাঠদানের খেদমতসহ তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে যেসব খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এর বিস্তারিত আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। শুধু কিছু খেদমতের আলোচনা করা হলো:

এক. ১৪০২ হিজরিতে হযরত মাওলানা মুফতি নেজাম উদ্দিন সাহেব রাহিমাহুল্লাহ দীর্ঘ দিনের ছুটি নেন। হযরত মাওলানা মুফতি মাহমুদ সাহেব গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহও সাহারানপুরে চলে যান। আরও কিছু মুফতিয়ানে কেরাম দারুল উলুম থেকে চলে যান। এজন্য কর্তৃপক্ষ তাঁকে কিতাব পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে ইফতা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক এবং ফতোয়া প্রদানের নির্দেশ দেয়। তিনি সুচারুরূপে তা আঞ্জাম দেন।

দুই. যখন দারুল উলুম দেওবন্দে মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তিনি এর নাজিম নিযুক্ত হন। ১৪১৯ হিজরিতে তিনি এই পদ থেকে অব্যাহতির আবেদন মজলিসে শুরা বরাবর করেন। কিন্তু মজলিসে শুরা তা গ্রহণ করেনি।

তিন. উল্লিখিত খেদমতের পরেও হযরত মুহতামিম সাহেব (কারি মুহাম্মাদ তায়্যিব রাহিমাহুল্লাহ) তাঁকে লিখিত অথবা মৌখিক বক্তব্য প্রদানের খেদমত সোপর্দ করতেন। তিনি তা সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতেন, যার দীর্ঘ ব্যাখ্যা এই সংক্ষিপ্ত লিখনিতে সম্ভব নয়।

রচনাবলি ও বইপুস্তক

তাঁর প্রকাশিত রচনাবলি ব্যাপক ও বিস্তৃত। কয়েকটি রচনার পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো-

১. **তাফসিরে হেদায়েতুল কুরআন**। এটি সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য একটি তাফসিরগ্রন্থ। ৩০তম পারা এবং এক থেকে নবম পারা পর্যন্ত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ উসমান কাশিফ আলহাশিমি সাহেব রাজপুরি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন। এটি মোট আট খণ্ডে। দুই খণ্ড বাদে বাকি ছয়টি খণ্ড তাঁর লেখা। অবশ্য হাশেমির লেখা দুই খণ্ডও তিনি আবার নতুন করে লিখেছেন।

২. **রহমতুল্লাহিল ওয়াসিআ শরহে উর্দু হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ**। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। এর দ্বারাই তিনি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছেন, যা বিশাল কলেবরে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত। এছাড়াও জনসাধারণদের জন্য এর পাঠাংশ ব্যতিরেকে মূল বিষয়বস্তু আলাদা করে 'কামিল বুরহানে এলাহি' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন এবং মূল বই টিকা-টিপ্পনিসহ দুই খণ্ডে ছাপা হয়।

৩. **তুহফাতুল কারি শরহে উর্দু সহিহুল বুখারি**। যা তাঁর তাকরিরের সমষ্টি। মোট ১২ খণ্ডে মুদ্রিত। এতে সহিহ বুখারির তারাজিম এবং ফিকহি মাসায়েল ও আসবাবে ইখতিলাফ অত্যন্ত সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহর সূক্ষ্মতা বুঝতে এই ব্যাখ্যাগ্রন্থ অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

৪. **তুহফাতুল আলমায়ি শরহে উর্দু সুনানে তিরমিজি**। যা মোট আট খণ্ডে প্রকাশিত। পুরা সুনানে তিরমিজি বুঝতে এর ভূমিকা অপরিসীম।

৫. **আলআউনুল কাবির**। যা আলফাউজুল কাবিরের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। তিনি মূল কিতাব আলফাউজুল কাবিরের আধুনিক ব্যাখ্যাও করেছেন, যা অত্যন্ত সুচারু ও গুরুত্ববহ। এটি নতুন আরবি, যা অতীতের অন্যান্য আরবির সংস্করণ। দারুল উলুম দেওবন্দসহ অন্যান্য মাদরাসায় এখন এই অনুবাদই পড়ানো হয়। এছাড়া ফয়জুল মুনঈম, মাবাদিল ফালসাফা, মুইনুল ফালসাফা, মিফতাহুত তাহজিব, আসান মানতিক, আসান সরফ, মাহফুজাত, আপ কেসে ফাতওয়া দেঁ, কিয়া মুক্তাদি পর ফাতেহা ওয়াজেব হে, ইলমি খুতবাত, হায়াতে ইমাম আবু দাউদ, মাশাহির মুহাদ্দিসিন ও ফুকাহায়ে কেরাম আওর তাজকিরা রাবিয়ানে কুতুবে হাদিস, হায়াতে ইমাম তাহাবি, ইসলাম তাগাইউর পজির দুনিয়ে মে, নুবুওয়াত নে ইনসান কু কিয়া দিয়া, দাঁড়হি আওর আম্বিয়া কি সুন্নাতে, হুরমাতে মুসাহারাত, তাসহিল আদিল্লায়ে কামিলা, হাওয়াশি ও আনাভিন ইজাহুল আদিল্লা, হাওয়াশি ইমদাদুল ফাতাওয়া (১ম খণ্ড), জুবদাতুত তাহাবিসহ সর্বমোট ৪০ এর উর্ধ্বে তাঁর রচনাবলি দেশ-বিদেশে ব্যাপক সমাদৃত।

এছাড়াও তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত রচনা হচ্ছে জলসায়ে তাজিয়াত কা শরয়ি হুকুম, যা বাংলায় 'চেতনার মশাল' নামে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠদান ও রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য

তাঁর রচনাবলির বৈশিষ্ট্য বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা তাঁর ছাত্রত্ব গ্রহণে ধন্য হয়েছেন বা তাঁর লিখনির সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় রাখেন, তারা বিষয়টি পুরোপুরি অনুধাবন করতে সক্ষম। তাঁর বক্তব্যের ধরন অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী, তাঁর দরস খুবই সমাদৃত এবং সাধারণের বোধগম্য। এমনিভাবে তাঁর লিখনি অত্যন্ত সাবলীল। সাদাসিধে উপস্থাপনা, যা যে কেউ গ্রহণ করতে সক্ষম। তাঁর বক্তব্য যেমন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং ইলমি আঙ্গিকে পরিপূর্ণ ছিল, তেমনিভাবে তাঁর লিখনিও অত্যন্ত গোছালো, স্পষ্ট ও সমৃদ্ধ।

আরও কিছু গুণ

উস্তাদে মুহতারামকে আল্লাহ তায়ালা অনেক গুণে গুণান্বিত করেছিলেন. তাঁর রুচিবোধ ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ম। সাধাসিধে ও মনোরম স্বভাবের ছিলেন। প্রকৃতিতে ছিল মধ্যমপন্থা। হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার পরিপূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। যেকোনো বিষয়ের গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণের ক্ষমতায় ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর প্রতিটি কাজ হতো খুবই গোছালো ও পরিচ্ছন্ন। তাঁর দরস কতটা মনোরম ছিল সেটা শিক্ষার্থীরা ভালো করেই অবগত আছেন। তাঁর লিখনি এবং বক্তব্য ছিল অত্যন্ত সারগর্ভ, সুচারু ও সব বিষয়ের সমন্বয়কারী।

বাইয়াত ও অনুমতি

তিনি যেমনিভাবে ইলমে জাহিরের পরিপূর্ণতা রাখতেন তেমনি তিনি ইলমে বাতেন দ্বারাও পরিপূর্ণ ছিলেন। তবে এই বিষয়টি এতো গোপন রাখতেন, সাধারণত মানুষ মনে করতো তিনি শুধু ইলমে জাহেরিতেই দক্ষতা রাখেন। অথচ বাস্তবতা হলো, তিনি ছাত্রজীবন থেকেই হযরত শাইখুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য বুজুর্গানে দীনের সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন। বিশেষত হযরত মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব রায়পুরি রাহিমাহুল্লাহুর মজলিসে মাজাহেরুল উলুমে ছাত্র থাকাকালে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি হযরত মাওলানা মুফতি মুজাফফর হুসাইন সাহেব মাজাহেরি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বাইয়াতের অনুমতিও লাভ করেছেন।

বাইতুল্লাহ জিয়ারত

হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ কয়েক বার হারামাইন শরিফাইনের জিয়ারতে ধন্য হয়েছেন। সর্বপ্রথম ১৪০০ হিজরি মোতাবেক ১৯৮০ সালে পরিবারসহ জাহাজে করে সফর করেন এবং ফরজ হজ আদায় করেন। এরপর ১৪০৬ হিজরিতে আফ্রিকা থেকে দ্বিতীয়বার হজ আদায় করেন। তিনি তো প্রথমেই নিজের ফরজ হজ আদায় করেছিলেন– এজন্য এই দ্বিতীয় হজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বদলি হজ হিসেবে আদায় করেন। ১৪১০ হিজরি মোতাবেক ১৯৯০ সালে সৌদির হজ মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে তৃতীয়বার হজ আদায় করেন। এছাড়া আরও অনেকবার হজ-উমরাহ দ্বারা ধন্য হয়েছেন।

মা-বাবার ইন্তেকাল

যখন শাইখুল ইসলাম মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানি, মাওলানা বদরে আলম মিরাঠি এবং মুহাদ্দিসে কাবির হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি রাহিমাহুল্লাহ ডাবেলে পাঠদান করতেন, সে সময় তাঁর বাবা সেখানে পড়তেন এবং হযরত মাওলানা বদরে আলম সাহেব মুহাজিরে মাদানির খাদেম ছিলেন। কিন্তু পারিবারিক দূরাবস্থার কারণে শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারেননি। এজন্য তিনি তার ছেলেদের মাওলানা

শাব্বির আহমাদ উসমানি, মাওলানা বদরে আলম মিরাঠি এবং মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ বানুরির মতো রত্ন বানানোর আগ্রহ রাখতেন। মাওলানা বদরে আলম রাহিমাহুল্লাহু তাঁকে নসিহত করেছিলেন– 'ইউসুফ! যদি তুমি তোমার ছেলেদের ভালো আলেম বানাতে চাও, তাহলে হারাম এবং নাজায়েজ সম্পদ উপার্জন থেকে বিরত থাকো এবং ছেলেদেরও হারাম-নাজায়েজ সম্পদ থেকে বাঁচিয়ে রেখো। কেননা নাজায়েজ এবং হারাম সম্পদ দ্বারা যে শরীর গঠন হয়, তাতে এই নুরের অনুপ্রবেশ ঘটে না।'

এই নসিহত হযরত মাওলানা রাহিমাহুল্লাহ সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহর সম্মানিত পিতাকে এজন্যই করেছেন, সেকালে সুদের ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং হযরতের দাদা সুদ গ্রহণ করে একটি জমিও কিনেছিলেন। তাঁর বাবা তখন ডাবেলের ছাত্র ছিলেন। এ ব্যাপারে হযরতের দাদার সঙ্গে তাঁর বাবার মতবিরোধ দেখা দেয়। এতে দাদা তার ছেলেকে পৃথক করে দেন। এজন্য হযরতের বাবা হারাম সম্পদ থেকে বাঁচার জন্য বাধ্য হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন যে, প্রয়োজনে নিজে অনাহারে থাকব, তবুও হারাম সম্পদ স্পর্শ করবো না। আমি যদিও লেখাপড়া করতে পারিনি, আল্লাহ তায়ালা যেন আমার সন্তানদের ইলমে দীন দান করেন। সুতরাং হযরত সাঈদ আহমাদ পালনপুরী সাহেবের সম্মানিত পিতা অবৈধ, হারাম মাল এবং সন্দেহপূর্ণ সম্পদ থেকে বেঁচে থাকতেন এবং নিজের সন্তানদেরও বাঁচাতেন। তাদের শিক্ষাদীক্ষার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দেন। নামাজ-রোজা পাবন্দির সাথে আদায় করতেন। হযরত পালনপুরি রহ.-এর মায়ের ইন্তেকালের পর তাঁর বাবা বৃদ্ধ বয়সে কুরআন শরিফ মুখস্থ শুরু করেন। ৭/৮ পারা মুখস্থ করেও ফেলেন। কিন্তু হায়াতে সাড়া দেয়নি।

১৪১৩ হিজরির জিলকদ মাসে একদিন তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য তিনি উঠেন। একটু গরম অনুভব হলে গোসল করে কাপড় পরিবর্তন করেন। তখন বুকে ব্যথা অনুভব হলে ছেলে আবদুল মাজিদকে আওয়াজ দিয়ে ডাকেন। আবদুল মাজিদ তাড়াতাড়ি তার খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখেন তার সমস্ত শরীর ঘেমে গেছে। তিনি নিজেই বুক

দাবিয়ে চৌকির উপর বসে আছেন। বাবাকে এই অবস্থায় দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েন। ভাই আবদুর রহমান, যিনি এক দেড় মাইল দূরে থাকতেন, তাকে ডাকেন। এছাড়া ডাক্তার আনার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু তার পিতা বললেন, ডাক্তার ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই। একথা বলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তাঁর সম্মানিত মাতাও ছিলেন অত্যন্ত দীনদার। পারিবারিক সব বিষয় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আঞ্জাম দিতেন। নামাজ-রোজার প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন। তিনি ইবাদতগুজার ও ধৈর্যশীল নারী ছিলেন। ১০ই মুহররম ১৩৯৯ আশুরার রোজা রেখে ইফতারের পর তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

ভাইদের শিক্ষাদীক্ষা

হযরত সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রহ.-এর চার ভাই ও চার বোন ছিলেন। এছাড়া মা-শরিক একজন ভাই ছিলেন। তার নাম ছিল আহমদ। যিনি তাঁর থেকে বড় ছিলেন এবং ভাই-বোনদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবার বড়। পরে আবদুর রহমান, মৌলভি আবদুল মাজিদ, আমিন পালনপুরী। অতঃপর মাওলানা হাবিবুর রহমান। তিনি যখন দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হন তখন আবদুর রহমানের বয়স ছিল ১৫ বছরের বেশি। আমিন পালনপুরী ও আবদুল মাজিদ তখন মক্তবে পড়তেন। এজন্য প্রথমেই আমিন পালনপুরীকে নিজের সঙ্গে দেওবন্দ নিয়ে যান, এক বছর পর ভাই আবদুল মাজিদকেও কাছে নিয়ে আসেন। ফতোয়া অনুশীলনের পাশাপাশি ভাইদেরও তিনি পড়াতেন।

পরিবার-পরিজনের শিক্ষাদান

হযরতের বৈবাহিক সম্পর্ক এবং সুন্নাতি আকদ মামা হাফেজ মৌলভি হাবিবুর রহমান সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর বড় মেয়ের সাথে ১৩৮৪ হিজরির শেষ দিকে সম্পন্ন হয়। তাঁর মামা এবং শ্বশুর কুরআনে কারিমের ভালো হাফেজ ছিলেন। তিনি ডাবেলে পড়াশোনা করেন। তাঁর মায়ের ইন্তেকালের পর দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় কুরআনে করিম খতম করে ইসালে সওয়াব করতেন। কিন্তু যৌবনকালেই দুই মেয়ে, এক ছেলে রেখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হযরতের স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও ইবাদতগুজার। তিনি কুরআনে কারিমের একজন ভালো হাফেজাও ছিলেন। নিজের সব ছেলে-মেয়ের হিফজের শিক্ষিকা ছিলেন। বিয়ের পর ঘরের কাজ আঞ্জামের পাশাপাশি হযরতের কাছে কুরআন মুখস্থ করেন। তিনি নিজের ১১ ছেলে, দুই মেয়ে এবং দুই পুত্রবধূকে হাফেজা বানিয়েছেন।

সন্তানাদি

এই ভাগ্যবান নারীর গর্ভে ১১ ছেলে ও তিন মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সবার বড় ছেলে একটি দুর্ঘটনায় শাহাদাত বরণ করেন এবং এক মেয়ের বাল্যকালেই ইন্তেকাল হয়ে যায়। আরও এক ছেলে গত বছর মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে নয় ছেলে, দুই মেয়ে রেখে যান।

গুরুত্বপূর্ণ একটি ওসিয়ত

ছেলের অবর্তমানে নাতিদের মিরাস থেকে বঞ্চিত হওয়া একটি প্রসিদ্ধ মাসয়ালা। ফারায়েজশাস্ত্রের 'আল আকরাব ফাল আকরাব'- এই নীতিমালার ভিত্তিতে এটা করা হয়। এই নীতিমালা থেকেই পিতার বর্তমানে দাদা বঞ্চিত হয়, ভাইয়ের বর্তমানে অন্য ভাইয়ের সন্তান হয় বঞ্চিত। কিন্তু নাতিদের মাসয়ালা নিয়ে অনেক লোক ইসলামি শিক্ষার ওপর আঙ্গুল উঠাতে চেষ্টা করে। তারা বলে– এটা কেমন ইনসাফ? ছেলে উত্তরাধিকারী হবে, কিন্তু নাতি-নাতনি যারা সাধারণত দুর্বল এবং অসহায় হয়ে থাকে তারা মাহরুম থাকবে? এই অভিযোগটি মুসলমানদের আচরণের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামি শিক্ষা প্রত্যেক দিক থেকেই পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু মুসলমানরা এর সঠিক পন্থার ওপর আমল না করলে এর চিকিৎসা কী হবে? ইসলাম এক তৃতীয়াংশ সম্পদে ওসিয়তের অধিকার তো দিয়েছে। এমন প্রয়োজনীয় খাতে ওসিয়তের সুযোগ রয়েছে। অতএব দাদার জন্য উচিত হলো– প্রথমে নাতি-নাতনিদের জন্য ওসিয়ত করা। প্রয়োজনে তাদেরকে ছেলের অংশের চেয়েও বেশি ওসিয়ত করা। এখন যদি দাদা সম্পদের মহব্বতে ওসিয়তের সাহস না করেন এবং আকস্মিক চলে যান আর নাতি-নাতনিরা বঞ্চিত থাকে, তাহলে এটা ইসলামি শিক্ষার দোষ নয়, বরং দাদারই দোষ। কারণ তিনিই জিম্মাদার।

যখন হযরতের বড় ছেলে মুফতি রশিদ আহমাদ রাহিমাহুল্লাহুর আকস্মিক শাহাদাতের ঘটনা ঘটে, তখন বাড়ি (পালনপুর) থেকে সব ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন শোক জানাতে দেওবন্দে আসেন। তখন হযরত পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ নিজের ছেলেদের এবং ভাই-বোনদের সামনে মরহুমের বাচ্চাদের জন্য এই ওসিয়ত করলেন যে, 'যতক্ষণ আমি জীবিত থাকব মরহুমের দুই বাচ্চাকে আমার ছেলেদের মতো লালন-পালন করব। আর মৃত্যুর পর আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে মরহুমের প্রত্যেক বাচ্চা একজন ছেলের পরিমাণ অংশ পাবে। কেননা দুই ছেলের মিরাসও এক তৃতীয়াংশ থেকে কম হবে। আমার এক তৃতীয়াংশে ওসিয়তের অধিকার রয়েছে।' সমস্ত আত্মীয়-স্বজন এই ওসিয়তের সাক্ষী ছিলেন।

ওসিয়তের পর তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি বললেন– আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শোকর, যিনি আমার একজন বাচ্চা নিয়ে গেলেন, এর বদলে দুজন বাচ্চা দান করলেন। এখন আমার ১২ জন সন্তান হয়ে গেল।

আল্লাহ তায়ালা হযরতকে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন। পরিবার, ছাত্র এবং সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ও ভক্ত-অনুরাগীদের ধৈর্য ধারণের তাওফিক দিন।[৩৭]

তিনি যখন ব্যবসায়ী

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম দীনি বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক ও শায়খুল হাদিস ছিলেন। তাঁর দরসের কথা আমরা সবাই কমবেশি জানি, শুনেছি। কিন্তু এর বাইরেও তাঁর অনেক বড় একটি পরিচয় আছে, সেটা অনেকেই জানি না। মাদরাসা শিক্ষকের পাশাপাশি তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। একজন মাদরাসা শিক্ষক থেকে কীভাবে তিনি সফল ব্যবসায়ী হলেন? দারুল উলুমের এক দরসে ছাত্রদের সেই গল্প শুনিয়েছেন তিনি নিজেই। তাঁরই মুখেই শুনুন ব্যবসায়ী হয়ে ওঠার গল্প। তিনি বলেন–

---

৩৭. মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর ওপর মূল প্রবন্ধটি অনুবাদ করেন বন্ধুবর মাওলানা উবায়দুল্লাহ আসআদ কাসিমী। অধম প্রবন্ধটিতে কিছু সংযোজন-বিয়োজন করে এই বইয়ে যুক্ত করে দিয়ে দিলাম।

'দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হওয়ার পর গুজরাটের একটি মাদরাসায় ১৪০ রুপি বেতনে আমার চাকরি ঠিক হয়। কিন্তু বাজারদরের তুলনায় যা ছিল অনেক কম! আমি ভাবতে লাগলাম– পরিবার দেখাশোনার জন্য মাদরাসায় খেদমতের পাশাপাশি আমাকে বাড়তি কিছু করতে হবে। আমি তাসনিফাতের (লেখালেখি) কাজ অর্থাৎ– কিতাব লেখা শুরু করলাম। প্রথম যে কিতাবটি লিখেছিলাম সেটার নাম ছিল 'দাড়ি রাখা সুন্নাত'।

কিতাবটি লিখে দেওবন্দের একটি প্রকাশনীতে পাঠিয়ে দিলাম ছাপানোর জন্য। সেখান থেকে ছেপে গুজরাটে আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আমি একজন লোকের মাধ্যমে সেই কিতাবটি বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করতে পাঠাতাম। তারও কিছু কমিশন থাকতো, আমারও কিছু থাকতো। এরপরে আমি আরও কিছু ছোট ছোট রেসালা (বই) লিখে সেগুলো এভাবে বিক্রি করতে লাগলাম। গুজরাটের এই মাদরাসায় আমি নয় বছর ছিলাম। ইতিমধ্যে দেওবন্দ থেকে আমার ডাক পড়লো, চলে এলাম সেখানে।

দেওবন্দে এসেও লেখালেখির কাজ চালিয়ে গেলাম। এখানে প্রথম যে কিতাবটি লিখেছিলাম সেটা ছিল আল ফাউজুল কাবিরের আরবি ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আউনুল কাবির'। সেটি লেখার পরে আমি খুব বিপদে পড়ে গেলাম! কারণ–কোনো প্রকাশকই তাদের লাইব্রেরি থেকে ছাপাতে চাচ্ছিল না আমার এই শরাহটি! তারা বলতে লাগলো– তোমার এই আরবি শরাহ্ পড়ার লোক হিন্দুস্তানে নেই!

তবুও নিরাশা না হয়ে বিভিন্ন লাইব্রেরিতে ঘুরতে লাগলাম যদি কেউ ছাপে সেই আশায়, কিন্তু কেউই ছাপলো না। মনটা ভীষণ খারাপ ছিল! দারুল উলুমের লাইব্রেরিতে কিতাব মুতায়ালা করছিলাম। ইতিমধ্যে দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতি আসলাম

কাসেমি নামে একজন সিনিয়র শিক্ষক (যিনি পরবর্তী সময়ে দারুল উলুম ওয়াকফ দেওবন্দের শায়খুল হাদিস এবং সদরুল মুদাররিসিন ছিলেন) লাইব্রেরিতে এলেন।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন— মৌলভি সাঈদ! তোমাকে চিন্তিত লাগছে কেন? তখন হযরতের কাছে সব ঘটনা খুলে বললাম। হযরত আমাকে নিজে অর্থ সহায়তা করে বললেন, যাও! নিজেই লাইব্রেরি করো এবং সেখান থেকেই তোমার কিতাবগুলো ছাপাও।

হযরতের পরামর্শনুযায়ী আমি দরস-তাদরিসের পাশাপাশি লাইব্রেরির কাজও শুরু করলাম। লাইব্রেরির নাম দিলাম মাকতাবাতুল হিজাজ। আর আল ফাউজুল কাবিরের সেই শরাহটিও মাকতাবাতুল হিজাজ থেকেই ছাপালাম। এরপরে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ফনের (বিষয়ের) ওপর কিতাব লিখতে থাকলাম এবং সে কিতাবগুলো আমার মাকতাবাতুল হিজাজের নামেই ছাপিয়ে বিক্রি করতাম।

এভাবে ধীরে ধীরে আমার কিতাবগুলো অনেক চলতে লাগলো, ব্যবসার পরিধিও বাড়তে লাগলো। বাড়তে বাড়তে একপর্যায়ে আলহামদুলিল্লাহ এতো পরিমাণ হলো যে— আমার লাইব্রেরি ব্যবসা থেকেই আমার পরিবারের যাবতীয় খরচের ব্যবস্থা হয়ে যেতো এবং তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, দারুল উলুম থেকে আর বেতন নেবো না।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দারুল উলুম দেওবন্দের তৎকালীন মুহতামিম আল্লামা মারগুবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ বরাবর দরখাস্ত লিখে জানালাম যে— হযরত! আমার মাকতাবা থেকে প্রাপ্ত আয়ের মাধ্যমে আমার পরিবারের পুরোপুরি খরচ উঠে আসছে, অতএব আমার এখন দারুল উলুম থেকে বেতন নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

হযরতও আমার দরখাস্ত কবুল করে স্বাক্ষর করে আমার মুনাফা বৃদ্ধির জন্য দোয়া লিখে দেন। সেই দরখাস্ত আজও দারুল উলুমের মহাফেজখানায় (রেকর্ড রুম) সংরক্ষিত আছে।

প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা!

নিজের প্রকাশনী গড়ে তোলার গল্প বলার পর হযরত পালনপুরি রহ. ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলেন: তোমাদেরকেও বলি— মাদরাসা মসজিদে খেদমতের পাশাপাশি যেকোনো একটি ব্যবসা করবে এবং শুরুতেই নিয়তকে সহিহ করে নেবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসা করেছেন, ব্যবসা করা সুন্নত। অতএব আমিও সুন্নাতের নিয়তে ব্যবসা করছি, তবেই দেখবে ব্যবসায় অনেক বেশি বরকত হতে থাকবে!

বর্তমানে মাদরাসায় পড়ানো কিংবা মসজিদে ইমামতি করার পাশাপাশি রোজগারের জন্য কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়ানোকে অনেকেই খারাপ মনে করে থাকেন। ভাবেন, আলেম মানেই তো শুধু মাদরাসা, মসজিদ, খানকা নিয়েই পড়ে থাকা এক গোষ্ঠীর নাম।

সাধারণের পাশাপাশি এমনটা আলেমরাও ধারণা করে বসছেন আজকাল। অথচ নিজ হাতে জীবিকা উপার্জন করা একটা উত্তম কাজ। এটা তাকওয়া, পরহেজগারির বিপরীত কোনো বিষয় নয়। বুখারি শরিফের ২৭৮ নম্বর পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ও রয়েছে।

তাছাড়া নবী-রাসুল, সাহাবায়ে কেরাম ও আকাবিরের প্রায় প্রত্যেকেই ধর্মীয় কাজের পাশাপাশি সংসার পরিচালনার জন্য কোনো একটি পেশা বা কাজ বেছে নিয়েছিলেন।

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি লৌহবর্ম তৈরি করতেন। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম ঝুড়ি বানাতেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই নানা ধরনের ব্যবসা করেছেন।

এই তো কয়েকশ' বছর আগেও বাদশাহ আওরঙ্গজেব রাহিমাহুল্লাহ নিজ হাতে কুরআন শরিফ লিখতেন এবং তা বিক্রি করতেন। আজও দারুল উলুম দেওবন্দের কুতুবখানায় তাঁর হাতে লেখা কুরআনে কারিমের সেই কপি হুবহু বিদ্যমান।

দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার আগে শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবি রাহিমাহুল্লাহ মিরাঠের একটি ছাপাখানায় প্রুফ দেখার কাজ করতেন। দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর তা ছেড়ে দেওয়ার তাগাদা দিয়ে চিঠি দেওয়া হলো।

তিনি আরজ করলেন, 'সব ছেড়ে দিলে আমার পরিবারের খরচ বহন করব কী করে!' তাহলে কি তার মাঝে কোনো তাকওয়া, পরহেজগারি ছিল না? অবশ্যই ছিল। অধিক তাকওয়ার ফলেই দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে তিনি কোনো দিনও বেতন গ্রহণ করতেন না।

কিছু অমূল্য বাণী

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর বাণীগুলো ছিল বেশ অমূল্য। তিনি প্রায়শই বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর কথা বলতেন। তার এমন কিছু মুখনিঃসৃত অমূল্য বাণী মাসিক 'আরমুগান' তাদের এক সংখ্যায় ছেপেছিল। পাঠকের উপকারের কথা ভেবে সেই বাণীগুলো বাংলায় রূপান্তর করা হলো।

এক. ছোটলোকদের ক্ষমতা বা দাপট বাড়লে তাদের ছোটলোকি যায় না। হ্যাঁ, তাতে ভদ্রজনদের ভদ্রতার জানাজা হয়ে যায়।

দুই. চন্দ্র মাসের হিসাব মনে রাখা এবং তার সংরক্ষণ করা ফরজে কেফায়া। কারণ– শরিয়তের অসংখ্য বিধি-বিধান এর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

তিন. ধন-সম্পদ হচ্ছে বিলীয়মান ছায়া। আজ এদিকে, তো কাল ওদিকে। ভাগ্যবান সে, যে এ নেয়ামত থেকে যথাসময়ে ফায়দা তুলে নেয়।

চার. জীবিকা অন্বেষীরা! সন্তানও এক ধরনের জীবিকা। আর এক জীবিকার দ্বারা আরেক জীবিকার দরজা খোলে।

পাঁচ. মদ, নাচ, গান, টিভি, ভিসিআর, ছবি এবং বেপর্দা চলাফেরা ব্যভিচারের চোরা দরজা। এসব থেকে পরিপূর্ণ বেঁচে থাকো।

ছয়. হালাল এবং হারাম এক নয়। যদিও হারামের প্রাচুর্য মানুষের উত্তম মনে হয়।

সাত. অহংকার হলো– হককে গ্রহণ না করা এবং অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

আট. সমস্ত জগত একাকী আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। তাই তার অংশীদার সাব্যস্ত করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

নয়. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শত্রুরা এই সুধারণায় কখনও যেন না থাকে যে– তারা চিরকাল আমোদ-ফূর্তি করে যাবে। একটা সময়ের পর তাদের মন্দ পরিণাম অপেক্ষা করছে।

দশ. যখন অন্তর অন্ধ হয়ে যায় তখন নসিহত-উপদেশ মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। আর যখন চোখ অন্ধ হয়ে যায় তখন চিহ্ন-সংকেত অর্থহীন হয়ে যায়।

এগারো. হে লোকসকল! কুরআনে কারিমের কদর করো। কুরআনে কারিম হচ্ছে সেই নেয়ামত, যা তার অনুসারীদের দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠ এবং আখেরাতে চিরস্থায়ী বাসস্থানের অধিকারী বানায়।

বারো. এই দৃষ্টিভঙ্গি ভুল যে– রাসুল খোদায়ী শক্তি ও ক্ষমতার মালিক। তাঁর কাজ কেবল হকের পয়গাম পৌঁছে দেওয়া।

তেরো. এই দুনিয়া আমলের স্থান। ফায়সালা বা মীমাংসার জায়গা নয়। ফায়সালার দিন কেয়ামত দিবস। যা দ্রুত এগিয়ে আসছে।

চৌদ্দ. আল্লাহ সুবহানু ওয়াতায়ালার অপার অনুগ্রহ যে- তিনি তাঁর দুশমনকেও খুব আরাম-আয়েশ দান করেন। এটা তাঁর ছাড় দেয়ার নীতি। এতে যেন কেউ প্রতারিত না হয়।

পনেরো. দুনিয়ার জীবন অল্প দিনের। এখানে যা করার করে নাও। এর পরিণাম ধ্বংস।

ষোলো. দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগি বানানোর ফিকির করো না। আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগির ফিকির করো। সেটির কামিয়াবি আসল কামিয়াবি।

সতেরো. কালেমা তাইয়েবা জান্নাতের চাবি। নেক আমল হচ্ছে তার দাঁত (ভেতরকার উঁচু-নিচু খাঁজ)। আর চাবি তখনই কাজ করে যখন তার দাঁতগুলো ঠিক থাকে।

আঠারো. তালিবে ইলমের জন্য উস্তাদের আনুগত্য এবং অধীনতা অপরিহার্য। এছাড়া ইলম হাসিল হয় না।

উনিশ. জান্নাত আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘর। আর তা ওই লোকদের মিরাস, যারা ঈমানদার এবং সততা ও পবিত্র জীবন-যাপন করে।

বিশ. সব আমলে গোপনীয়তা উত্তম। তবে কোনো কারণবশত যেমন অপবাদ দূর করা বা অনুসরণের আশা ইত্যাদির কারণে প্রকাশ করার বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করে।

একুশ. কুরআনে কারিম রহমত ও নুর। সামর্থ্য অনুযায়ী এর প্রচার-প্রসার এবং তেলাওয়াত করা চূড়ান্ত পর্যায়ের সৌভাগ্য।

বাইশ. কেয়ামত এবং মৃত্যুর সময় এজন্য গোপন রাখা হয়েছে, যাতে মানুষ আমলের প্রতি উদাসীন না হয় এবং অনবরত প্রচেষ্টায় রত থাকে।

চব্বিশ. আল্লাহ তায়ালার দীন উভয় জাহানের কল্যাণের জামিন। অতএব, মানুষ যেন এর কদর করে।

পঁচিশ. যারা কেয়ামতের দিন জীবিত হওয়াকে অবিশ্বাস করে তারা চিন্তা করুন, প্রথমবার তারা কীভাবে জীবিত হয়েছেন।

ছাব্বিশ. সত্যিকার ঈমান যখন কারও নসিব হয়, চাই এক মুহূর্তের জন্য হোক- তখন তা এমন রূহানি শক্তি সঞ্চার করে যে, শক্তিশালী থেকে শক্তিশালী ক্ষমতাধরও তাকে দুর্বল বা ভীত করতে পারে না।

সাতাশ. যে মুমিন মৃত্যুর পরপরই জান্নাতের প্রত্যাশী, তার জন্য ফরজ আমল থেকে গাফেল হওয়া এবং গোনাহে লিপ্ত না হওয়া উচিত।

আঠাশ. বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির মানসিকতা অপরিপক্ক মানসিকতা। বাস্তবোচিত মানসিকতাই আদর্শ মানসিকতা।

উনত্রিশ. আখেরাত হলো দুনিয়ার প্রতিচ্ছবি। যে এখানে অন্ধ হয়ে আছে, আখেরাতে তাকে অন্ধ করে উঠানো হবে। বরং অন্ধের চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থায়।

ত্রিশ. যে কাফেররা রাসুলের মর্যাদাহানি করে এবং তাঁকে নিছক নিজেদের পর্যায়ের মানুষ গণ্য করে, আর যারা রাসুলের সম্মান বৃদ্ধি করে এবং তাঁকে আল্লাহ তায়ালার পুত্র, আলিমুল গায়েব (অদৃশ্যের জ্ঞানী) এবং অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক ও হস্তক্ষেপকারী বিশ্বাস করে তারা সবাই ভ্রান্ত। সঠিক বিশ্বাস সেটি, যা কালেমায়ে শাহাদাতের মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ- 'হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও রাসুল।'

একত্রিশ. ধন-সম্পদ, শক্তি এবং প্রতিপত্তির নেশা ওইসময় (তাড়া খাওয়া) হরিণ হয়ে যায়, যখন আজাবের চাবুক বর্ষণ শুরু হয়।

বত্রিশ. এই দুনিয়ায় বাতিল লম্ফঝম্ফ-মাতামাতি করে বেড়ায়; কিন্তু যখন হক তার পিছু নেয়, তখন বাতিলের মাথাকে সে পিষ্ট করে ছাড়ে।

তেত্রিশ. মানুষ আল্লাহ তায়ালার আজাবের সামান্যতম ঠুকাও বরদাশত করতে পারবে না। কিন্তু (তাদের) গাফলত এ পর্যায়ের যে- আজাবের কারণের স্তূপ জড়ো করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।[৩৮]

গুরুত্বপূর্ণ কিছু নসিহত

দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক শাইখুল হাদিস ও শীর্ষ ইসলামি ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহুর গুরুত্বপূর্ণ নসিহত থেকে দুটি বিষয়ের ওপর নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

এক. ছাত্রদের উদ্দেশ্যে।

দুই. উস্তাদদের উদ্দেশ্যে।

তিনি বলেন, ছাত্রদের কাজ তিনটি। যথা–

১. দরসে বসার আগে মুতালায়া করা। মুতালায়ার নিয়ম হচ্ছে- উস্তাদ যতটুকু সবক দেবেন- অনুমান করে ততটুকু পরিমাণ ইবারত কমপক্ষে তিনবার দেখে যাওয়া। এমনটি নয় যে, কামা-হক্কুহু (পুরোপুরি) বুঝতে হবে। তবে যদি এই তিনবার ইবারত পড়ার দ্বারা বুঝে আসে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। অন্যথায়, এতটুকুর ওপরই ছেড়ে দেবে। এমনটি যেন না হয় যে, সামনের সবক একেবারে দেখা হয়নি। মুতালায়া করার পর দরসে বসে যদি কোনো মাসয়ালা উস্তাদের মুখ থেকে তেমনটি শুনে যেমনটি মুতালায়া করে বুঝেছে; তাহলে আল্লাহর শোকর আদায় করবে।

২. দরসে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সবক বোঝার চেষ্টা করবে। ক্লাসে সবক বুঝে না এলে ক্লাস শেষে মুতালায়ার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করবে। তবুও বুঝে না এলে ওই কিতাব যিনি পড়ান তার কাছে যাবে। তারপরেও বুঝে না এলে বিজ্ঞ কোনো উস্তাদের শরণাপন্ন হবে। যেকোনো মূল্যে কিতাব বুঝে নেবেই। এমনটি

৩৮. উর্দু মাসিক 'আরমুগান' থেকে ভাষান্তর

যেন না হয় যে, সবক বুঝলে কোনো আনন্দ নেই না বুঝলেও কোনো পেরেশানি নেই। যে ছাত্র ক্লাসে চুপচাপ বসে থাকে, কোনো প্রশ্নও করে না, কোনো কিছু বুঝতেও চায় না, সে পড়ছে না, বরং পড়াচ্ছে।

৩. প্রতিদিনের সবক প্রতিদিন মুখস্থ করা। যে ছাত্র এক দিনের সবক মুখস্থ করল না, পরদিন তার দুই দিনের সবক জমা হয়ে গেল। আর যে দুই দিনের সবক মুখস্থ করল না, পরদিন তার তিন দিনের সবক জমা হয়ে গেল। এমন করে সবক মুখস্থ না করতে না করতে এক বোঝা সবক হয়ে গেল, যা সে মুখস্থ করেনি। এরপর সবকের এই বিশাল বোঝা সে কীভাবে আয়ত্ব করবে?

ইলম আসে মুখস্থ করার দ্বারা। যে তালিবুল ইলম সবক মুখস্থ করে না তার কখনও ইলম আসবে না। যে ছাত্র সবক মুখস্থ করে না তার একটি দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হযরত বলেন– আমি কাউকে বললাম কোনো হিন্দুকে পানি পান করাতে। সে পাত্র ভরে পানি নিয়ে গেল। হিন্দু যেহেতু মুসলমানের পাত্রে মুখ লাগায় না, তাই পাত্রের সঙ্গে হাতের তালু লাগিয়ে পানি পান করতে চাইল। এমতাবস্থায় সেই হিন্দুর মুখে কি পানি ঢুকবে? কখনও ঢুকবে না। ঠিক তেমনি, যে ছাত্র সবক মুখস্থ করে না, তার কখনও ইলম হাসিল হবে না।

হযরত বলেন– আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে শাহ আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহুকে বললেন, হুজুর! দিল্লির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। হুযুর বললেন– 'সাহেবে খেদমত ঢিলা হ্যায়'। বলা হলো– কে সেই খেদমতগার? তিনি বললেন– 'জামে মসজিদ মে খরবুজ বেচনেওয়ালা সাহেবে খেদমত'। পরীক্ষা করে দেখার জন্য সেই লোকটি তার কাছে গেলেন এবং খরবুজ কেনার ভান করে একটি খরবুজ কেটে বললেন, ভালো না। এভাবে সবগুলো খরবুজ কেটে কেটে দেখলেন, আর বললেন ভালো না। তারপর খরবুজ না কিনে চলে এলেন।

হযরতের একটি মূল্যবান সাক্ষাৎকার

মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ প্রায় একযুগ ধরে কৃতিত্বের সঙ্গে দারুল দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। অর্ধশতাধিক কিতাবের লেখক এই মনীষীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় স্নাত হয়েছিল পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসা শিক্ষার্থীরা। তিনি নিজেও পৃথিবীময় বিলিয়ে বেড়িয়েছেন জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার। দেশের বাইরে সফর খুব কম করলেও তাঁর প্রতিটি সফর ছিল তাৎপর্যবহ। মহান এই জ্ঞানবৃক্ষ তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। তাঁর পুরো সাক্ষাৎকারে ফুটে ওঠেছে–কওমি সিলেবাস পরিবর্তন-পরিমার্জনের বিভিন্ন দিক। উঠে এসেছে এই জাতির উপকারের নানা প্রসঙ্গ। ইন্তেকালের কয়েক বছর আগে নেওয়া হযরতের সেই সাক্ষাৎকারটি নিম্নে উল্লেখ করছি।

জিজ্ঞাসা[৩৯] *: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।*

পালনপুরি: ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

জিজ্ঞাসা: *হুযুর কেমন আছেন? শারীরিক অবস্থা কেমন আপনার?*

পালনপুরি: আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর রহমতে ভালোই আছি। তুমি কেমন আছ? কী বিষয়? কিছু বলবে নাকি?

জিজ্ঞাসা: *জি হুজুর, একটি বিষয় নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম। একটু সময় নিয়ে কথা বলতে চাই আপনার সাথে।*

পালনপুরি: ঠিক আছে বলো সমস্যা নেই।

জিজ্ঞাসা : *হুযুর বাংলাদেশে 'আওয়ার ইসলাম' নামে ইসলামিক একটি অনলাইন নিউজপোর্টাল রয়েছে। আমি পোর্টালটির দেওবন্দ প্রতিনিধি। আওয়ার ইসলামের পক্ষ থেকে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে একটি বিশেষ সংখ্যা বের হবে। এই সংখ্যায় আমরা আপনার একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করতে চাই।*

৩৯. অনলাইন নিউজপোর্টাল আওয়ার ইসলামের জন্য সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন দারুল উলুম দেওবন্দের বাংলাদেশি কৃতি ছাত্র, বন্ধুপ্রতিম তাওহীদ মাদানী

পালনপুরি: কী বিষয়ে?

জিজ্ঞাসা: *বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে।*

পালনপুরি: আহহা! শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সাক্ষাৎকার নিতে আসছ আমার কাছে? আমি তো ছোট মানুষ। কী সাক্ষাৎকার দেব? শিক্ষাব্যবস্থা তো অনেক বড় বিষয়। এ বিষয়ে কথা বলার যোগ্যতা তো আমার নেই। তবুও আসছো যখন বলো কোন দিক থেকে কী আলোচনা শুরু করব?

জিজ্ঞাসা: *জি হুজুর! শুরুতেই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আপনার ভাবনা শুনতে চাই। শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে মৌলিক কিছু কথা যদি বলতেন!*

পালনপুরি: আসলে দেখো, শিক্ষাব্যবস্থা বা তালিমি নেজাম মূলত একটি বিষয় নয়। বাস্তবিক অর্থে এখানে দুটি বিষয়। দুটি বিষয়ই ভিন্ন ভিন্ন। তালিম বা শিক্ষা একটি বিষয় আর নেজামে তালিম বা শিক্ষাব্যবস্থা আরেকটি বিষয়। আর উভয়টি যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, তাই এর ওপর আলোকপাতও করতে হবে ভিন্ন ভিন্নভাবে।

জিজ্ঞাসা: *জি। তাহলে হুজুর! প্রথমে তালিম সম্পর্কেই কিছু আলোচনা শুনি!*

পালনপুরি: আসলে তালিম সম্পর্কে কিছু বলতে হলে তো প্রথমে নেজামে তালিম নিয়েই আলোচনা করতে হয়। আলোচনার ফাঁকেই তালিমের বিষয়টাও চলে আসবে।

জিজ্ঞাসা: *ঠিক আছে হুজুর, পাঠকদের জন্য আপনি যেভাবে বলতে সুবিধা মনে করেন সেভাবেই বলুন!*

পালনপুরি: আচ্ছা, তাহলে আমি নেজামে তালিম থেকেই শুরু করি। নেজামে তালিম বর্তমান সময়ের কোনো বিষয় নয়। এটা চলে আসছে সেই আকাবিরের সময় থেকেই। আকাবিরের সময়ে যে নেজামে তালিম চালু ছিল বর্তমান সময়েও সেই নেজামে তালিমই চালু রয়েছে। শুধু ব্যবধান হলো পূর্বেকার সেই ধারাটা বর্তমানে সেভাবে আর বজায় নেই।

জিজ্ঞাসা: হুজুর, এই জায়গাটা যদি একটু স্পষ্ট করতেন। পূর্বের সেই ধারাটা বর্তমানে বজায় নেই বলতে কী উদ্দেশ্য?

পালনপুরি: আসলে নেজামে তালিম নিয়ে কথা বলার মতো কোনো যোগ্যতা বা সাহস আমার নেই। উপরন্তু আকাবিরের সময় থেকে চলে আসা নেজামে তালিম নিয়ে কিছু বলার কোনো প্রয়োজনও নেই। কেননা আকাবিরের সময়ে প্রণীত নেজামে তালিম পুরোপুরি ঠিকই ছিল। কিন্তু সমস্যা হলো পূর্বের সেই ধারা বর্তমানে আর অবশিষ্ট নেই। মানে সেই সময়ের প্রণীত নেজামে তালিমের মধ্যে বর্তমানে বেশকিছু ত্রুটি বিরাজ করছে। যেই ত্রুটিগুলো দূর করা সময়ের অপরিহার্য দাবি।

জিজ্ঞাসা: ত্রুটিগুলো কী? আর বর্তমানে সেই সময়ের রচিত এই নেজামে তালিমে যে ত্রুটিগুলো আছে তা দূর করার পথ বা তা থেকে উত্তরণের উপায় কী?

পালনপুরি: ত্রুটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বর্তমান সময়ের নেজামে তালিম মূলত আকাবিরের সময়েরই নেজামে তালিম। কিন্তু এই একই নেজামে তালিম সেই সময় জাতিকে যা উপহার দিয়েছে বর্তমানে তার বিন্দু পরিমাণও দিচ্ছে না। আর উত্তরণের উপায় বলতে চাইলে জরুরি তো হলো, ত্রুটি যে সৃষ্টি হয়েছে প্রথমে তা মেনে নেওয়া। এরপর উত্তরণের উপায় খোঁজা। কিন্তু পরিস্থিতি তো এমন, উত্তরণের উপায় খোঁজা তো দূরের কথা, উল্টো নেজামে তালিমে যে কিছু ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে তাও মানতে রাজি নয় কেউ কেউ। ফলে এসব ত্রুটি থেকে উত্তরণের উপায়ও অবলম্বন করা হচ্ছে না। তদুপরি বলতে চাই, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ, জিম্মাদার উস্তাদগণ, বিশেষভাবে মাদরাসা পরিচালনাকারী বোর্ড ও কর্তৃপক্ষের উচিত একত্রে বসে ত্রুটিগুলো কীভাবে সৃষ্টি হচ্ছে, কেন সৃষ্টি হচ্ছে, তার কারণ নির্ণয় করা। কারণগুলো নির্ণয় হলে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট তার সমাধান বের করতে সচেষ্ট হওয়া এবং পরিকল্পিতভাবে সেই সমাধানের পথ অবলম্বন করা।

জিজ্ঞাসা: আকাবিরের রচিত নেজামে তালিমে বর্তমানে যে ত্রুটিগুলো সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনে মূল কারণটা কী? এই ত্রুটিগুলো কেন দেখা দিচ্ছে?

পালনপুরি: আসলে এর পেছনে সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। ছড়ানো ছিটানো বিভিন্ন বিষয় কারণ হিসেবে যোগ হতে পারে এই ত্রুটিগুলো জন্ম নেয়ার পেছনে। যেমন, ধরা যেতে পারে– আকাবিরের সময়ের নেসাবে তালিম এখনও চালু আছে, কিন্তু এর প্রকৃতি বদলে ফেলা হয়েছে। কেননা তখন বর্তমান সময়ের মতো জামাতভিত্তিক পাঠদানের কোনো পদ্ধতি ছিল না। কিন্তু নেসাব এগুলোই ছিল।

আগে নিয়ম ছিল– নেসাবে যতদিন সময় লাগে সে নেসাবে ততদিন সময় দেওয়া। ফলে কোনো কোনো নেসাব শেষ হয়ে যেত এক বছরেই। আবার কোনো কোনো নেসাব তার চেয়ে কম সময়ে। আবার কোনো কোনো নেসাব তার চেয়ে বেশি সময়ে। যদি কোনো নেসাব এক বছরের আগে শেষ হয়ে যেত তাহলে ওপরের নেসাবে চলে যেতে পারত। আবার কোনো নেসাব এক বছরের পরও বাকি থেকে গেলে সেই নেসাবেই থাকতে হতো। কিন্তু বর্তমানে এই পদ্ধতিটা আর নেই। পরিপূর্ণ পাল্টে ফেলা হয়েছে।

এখন তো সব জামাতের জন্যই সময় বেঁধে দেওয়া, এক বছর। যদি এর আগে শেষ হয়ে যায় তাহলেও পরের জামাতে কেউ যেতে পারবে না। আবার শেষ না হলেও ওই জামাতে সে থাকে না। বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে সবাই অটোমেটিক উপরের জামাতে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এমন আরও বহু কারণ রয়েছে এই কমতিগুলো তৈরির পেছনে।

জিজ্ঞাসা: কিন্তু হুজুর, আমরা তো সবসময়ই দেখি বছর শেষ হতে হতে কিতাবাদিও সব শেষ হয়ে যায়!

পালনপুরি: বর্তমানে তো কোনো না কোনোভাবে নেসাব শেষ করেই দেন উস্তাদরা। তবুও প্রশ্ন থেকেই যায়। কতটুকু হক আদায় করা হয়? বছর শেষে তো '*চলো ভাই চলো*' করে করে শেষ করা হয়। এটাকে কি শেষ করা বলে?

জিজ্ঞাসা: জি না, হুজুর! বর্তমান সময়ের নেসাবে তালিম বা নেজামে তালিম সম্পর্কে আরও কিছু বলার থাকলে...

পালনপুরি: আসলে বর্তমান সময়ের নেসাবে তালিম বা নেজামে তালিম যেটাই বলা হোক, যদিও তা আকাবিরেরই, তবু এর মাঝে বিরাট পরিবর্তনও আনা হয়েছে।

একটা সময় পর্যন্ত দাওরায়ে হাদিসের পর আর কিছু পড়ানো হতো না। দাওরায়ে হাদিস শেষ তো প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখাও শেষ। এরপর কারও আগ্রহ থাকলে ব্যক্তিগত মুতালায়া চালু রাখত। কারও ইচ্ছা হলে তাদরিসি খেদমত শুরু করে দিত। কিন্তু বর্তমানে দাওরায়ে হাদিসের পর আরও কত কী? অভাব নেই জামাতের। অমুক তাখাসসুস তমুক তাখাসুস ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আগে তো এসবের কিছুই ছিল না। তাহলে নতুন করে কেন এসব প্রণয়ন করা হলো? দাওরা পড়েও যথাযথ যোগ্যতা হচ্ছে না বলে এসব জামাতের আবির্ভাব? দাওরা পর্যন্ত পড়েও থেকে যাওয়া কমতিগুলো দূর করার জন্যেই এসব জামাতের উদ্ভাবন? দাওরা পর্যন্ত পড়ার পরেও থেকে যাওয়া দুর্বলতা দূর করতেই এই প্রয়াস? তাহলে তো বিষয়টা হাস্যকর।

***জিজ্ঞাসা:** হুজুর, বিষয়টি যদি আরেকটু বুঝিয়ে বলতেন!*

পালনপুরি: আচ্ছা শুনো, ধরো সাত-আট তলাবিশিষ্ট একটি ভবন তৈরি করা হলো। কিন্তু ঘটনাক্রমে মাঝে কোনো এক জায়গায় একটু দুর্বলতা থেকে গেছে বা ধরা যাক ভবনটি মাঝ থেকে নড়বড়ে হয়ে গেছে। তো এই দুর্বলতা বা নড়বড়ে ভাব দূর করার উপায় কী হবে? আট তলার উপরে আরও কয়েক তলা বাড়িয়ে দেওয়া নাকি নিচে যেখানে নড়বড়ে হয়ে গেছে বা দুর্বলতা রয়ে গেছে সেখানে মেরামত করে দেওয়া? কেউ কি বলবে যে, ভবনটি উপরে আরও কয়েক তলা বাড়িয়ে দাও, তাহলে মজবুত হয়ে যাবে! উপরে আরও কয়েক তলা বাড়ালে ভবনটি মজবুত হবে, না আরও দুর্বল হবে?

***জিজ্ঞাসা:** হ্যাঁ, দুর্বল হবে।*

পালনপুরি: যদি দুর্বলই হয় তাহলে মজবুত করার পদ্ধতি কী হতে পারে? মজবুত করার পদ্ধতি একটিই হতে পারে। তা হলো– নিচের দুর্বলতা ও নড়বড়ে জায়গাটাকে মেরামত করে দেওয়া। অনুরূপ দাওরার নিচেও যদি কোনো দুর্বলতা থেকেই থাকে, তাহলে তা দূর করার পদ্ধতিটাও দাওরার নিচেই হওয়া উচিত। উপরে নয়।

***জিজ্ঞাসা:** হুজুর এমনটাও তো সম্ভব যে, দাওরার নিচে যে বিষয়ে দুর্বলতা রয়ে গেছে দাওরার উপরে মানে দাওরার পরে ওই বিষয়েই পড়ালেখায় মনোযোগী হলো। তাহলে তো তার পূর্বের থেকে যাওয়া দুর্বলতা কেটে যাবে। তার যোগ্যতা আরও বাড়বে, ভিত আরও মজবুত হবে।*

পালনপুরি: এটা তো যুক্তি দিয়ে মিলাতে চেষ্টা করছো। কিন্তু মিলছে না। দুর্বল বস্তুর ওপর কিছু রেখে তা মজবুত করা যায় না। বরং দুর্বল বস্তুকে মজবুত করতে হয় দুর্বল বস্তুর স্থানে বা পাশে কিছু রেখে। আর দাওরার পর অন্য কোনো জামাতে ভর্তি হয়ে দুর্বলতা কাটানোর প্রয়াস তো দুর্বল বস্তুর ওপর কিছু রাখারই নামান্তর। এতে দুর্বলতা তো দূর হবেই না বরং আরও বাড়বে। সুতরাং দুর্বলতা দূর করার একটাই নিয়ম, তা হলো দুর্বলতার স্থানে বা পাশে কিছু রাখা বা দুর্বলতার স্থানটিকে মেরামত করে দেওয়া।

***জিজ্ঞাসা:** বর্তমান সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আরও কিছু বলার থাকলে যদি বলতেন!*

পালনপুরি: বর্তমান সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন করে আর কী বলবো? বলতে গেলে তো কেবল আমার হাসিই আসতে থাকে। বলতে পারি না। বর্তমান সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা একটি গল্পের মতো। গল্পটি হলো এক ব্যক্তি প্রতিদিন এক বদনা পানি নিয়ে বনে যেতো, টয়লেটের প্রয়োজন সারতে। এরপর সে বনের মাঝে যেখানে প্রয়োজন সারতে বসতো সেখানে অন্য কেউ যাতে না এসে যায় সে জন্য সে নিদর্শনস্বরূপ বদনাটাকে খানিকটা দূরে রেখে এসে তারপর বসতো। আর প্রতিদিনই একটি কাক এসে তার পানির মাঝে বিষ্ঠা ছেড়ে দিয়ে পানি নষ্ট করে দিতো। ফলে সে প্রতিদিনই ঘরে এসে আবার পানি চাইতো। তখন ঘর থেকে জিজ্ঞেস করা হতো, প্রথমে যে পানি নেওয়া হয়েছে সেই পানির কী হয়েছে? তখন সে বলতো পানি তো কাকে নষ্ট করে ফেলেছে।

প্রতিদিনই একই কাহিনি ঘটতো তার সাথে। এরপর একদিন সে এসে আর পানি চাইলো না। তখন ঘর থেকে জিজ্ঞেস করা হলো আজ যে

পানি চাইলে না? তখন সে বলল– আজ তো আমি কাককে ধোঁকা দিয়েছি। জানতে চাওয়া হলো কীভাবে? সে বললো প্রথমে পানি খরচ করেছি এরপর টয়লেটের প্রয়োজন সেরেছি। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থারও অনুরূপ দশা। কুরআন (তরজমা) পড়া শেষ, হাদিস (তরজমা ও ব্যাখ্যা) পড়া শেষ, ফিকাহ পড়া শেষ, এরপর গিয়ে আদব পড়ে।

সবকিছু পড়া শেষ করে আদব পড়ার ফায়দা কী? যেখানে কুরআন তরজমার জন্য আদবের প্রয়োজন ছিল, যেখানে হাদিস ও ফিকহের জন্য আদবের প্রয়োজন ছিল তা তো সবই পড়া শেষ। তো এমন সময়ে একটা ছাত্র আদব পড়ে কী করবে? কোনো ফায়দা নেই তখন। ইলমের প্রকৃত স্বাদ পেতে হলে আদব পড়লে এগুলো পড়ার আগেই পড়তে হবে। নতুবা নয়।

জিজ্ঞাসা: আমাদের বর্তমান সিলেবাসটা তো এমনই। তাহলে এর সংস্কার ছাড়া অন্যকিছু করাও তো সম্ভবও নয়। তো এ ব্যাপারে কীভাবে কী করার? বা কী মতামত আপনার?

পালনপুরি: মতামত তো কতই আছে। কিন্তু কে মানে এসব মতামত? মতামত তো মতামতেই থেকে যাচ্ছে। মতামত ব্যক্ত করে কোনো ফায়দাও তো হচ্ছে না। তো কী লাভ এসব মতামত বলে বা শুনে?

জিজ্ঞাসা: তবুও যদি একটু বলতেন আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য!

পালনপুরি: হ্যাঁ! আসলে বলতে তো কোনো সমস্যাও নেই। বলার কাজ বলি। কেউ মানলে মানলো না মানলে নেই। মূলত কথা হলো, আমাদের যে দশ-বারো বছরের নেসাব তাতে যথাযথ ইস্তেদাদ বা যোগ্যতা তৈরি হচ্ছে না। এর সংস্কার অবশ্যই প্রয়োজন। এই নেসাব ও সিলেবাস সংস্কার করে যথাযথ যোগ্যতা অর্জনের পথ অবলম্বন করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সবার জন্য। তাহলে আর দাওরার পরে কোনো আদব বা অন্যান্য তাকমিলাতের প্রয়োজন পড়বে না বলে মনে করি।

জিজ্ঞাসা: তবুও যদি একান্তই তাকমিলাতের প্রয়োজন পড়েই যায় তাহলে কী করণীয়?

পালনপুরি: হ্যাঁ, যদি একান্তই তাকমিলাতে আদব বা উলুম বা তাফসিরের প্রয়োজন পড়েই যায় তাহলেও যেন ছাত্ররা পড়তে পারে সেই চিন্তাটাও নতুন সিলেবাস তৈরি করার ক্ষেত্রে করা উচিত। যাতে কোনো ছাত্রের যদি ওই তাকমিলাতসমূহ পড়তেই হয়, তাহলে সে যেন দাওরার আগেই পড়ে নিতে পারে। এরপর তাকমিলাতের প্রয়োজন শেষ, তো সে আবার নিয়ম মাফিক দাওরা পর্যন্ত পড়ে নেবে।

মোটকথা– যদি তাকমিলাতে আদব করতে মনে চায়, তাহলে আগেই করো যাতে কুরআন বুঝতে পারো। যদি তাকমিলাতে উলুম করতে মনে চায়, তাহলে আগেই করো যাতে হাদিস বুঝতে পারো। যদি তাকমিলাতে তাফসির করতে মনে চায়, তাহলে আগেই করো যাতে মাসয়ালা-মাসায়েল বুঝতে সহজ হয়ে যায়। দাওরার পর আর এগুলো পড়ে কোনো ফায়দা নেই। তবে তাকমিলাতে ফিকহের কথা ভিন্ন। এটা দাওরার পরই পড়তে হবে।

জিজ্ঞাসা: হুযুর তাহলে নেসাবের ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কী?

পালনপুরি: যেহেতু আমাদের নেসাব দুর্বল তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় হলো– নেসাব মজবুত করার বিষয়ে জোরদার ফিকির করা।

জিজ্ঞাসা: নেসাব জোরদার করার পদ্ধতিটা কী হতে পারে?

পালনপুরি: নেসাব জোরদার করার জন্য নেসাবটিকে মূলত দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা দরকার। প্রথম অধ্যায় হবে প্রথম জামাত থেকে শরহে বেকায়া পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় অধ্যায় হবে হেদায়া থেকে দাওরা পর্যন্ত। নিয়ম থাকবে– প্রথম অধ্যায়ের সফলতার পরই যেতে পারবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। আর সফলতার মাপকাঠি হলো– যথাযথ যোগ্যতা অর্জন হওয়া। আবার প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের মাঝে থাকবে তাকমিলাতের একটি অতিরিক্ত অধ্যায়। এ অধ্যায়টা থাকবে ঐচ্ছিক।

কেউ চাইলে পড়বে, না চাইলে নেই। তবে কেউ যদি নেসাবের প্রথম অধ্যায়ে যথাযথভাবে সফল হতে না পারে এবং যথাযথ যোগ্যতা অর্জন করতে না পারে তাহলে তাকে অবশ্যই নেসাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেতে

হলে দুই নেসাবের মাঝের এই অতিরিক্ত অধ্যায় পার করেই যেতে হবে। তখন আর তার জন্য এটা ঐচ্ছিক থাকবে না। বাধ্যতামূলক করা হবে। এরপর সে তাকমিলাতের অতিরিক্ত অধ্যায় শেষ করেই তবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারবে। নতুবা নয়। কেননা পড়ালেখার মূল ভিত্তিই হলো হেদায়ার আগ পর্যন্ত।

তাই যোগ্যতা যতটুকু অর্জন করার হেদায়ার আগেই করে নিতে হবে। হেদায়া থেকে শুরু করে হেদায়ার পর আর যোগ্যতা অর্জনের সময় থাকে না। তখন হলো যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর সময়।

জিজ্ঞাসা: *আচ্ছা তাহলে এই যে শরহে বেকায়া পর্যন্ত পড়েও যে বর্তমান সময়ে ছাত্রদের যথাযথ যোগ্যতা অর্জন হচ্ছে না, এর পেছনে কী কারণ রয়েছে? কেন অর্জন হচ্ছে না যথাযথ যোগ্যতা?*

পালনপুরি: সুন্দর একটি পয়েন্ট বলেছো। কেনও যোগ্যতা হচ্ছে না বা যোগ্যতা না হওয়ার পেছনে কারণ কী? আসলে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জন না হওয়ার পেছনে মূল কারণই হলো ইলমের প্রতি অনাগ্রহ। মূলত এই অনাগ্রহের কারণেই অর্জন হচ্ছে না যথাযথ যোগ্যতা।

জিজ্ঞাসা: *অনাগ্রহটা তৈরির কারণ তাহলে কী? এটা কি পূর্বে ছিল না? না থাকলে বর্তমানে কোত্থেকে এলো? বা কীভাবে এলো? আর যদি এমন হয় যে, পূর্বেও ছিল, তাহলে পূর্বে কেন অন্তরায় হয়নি এই অনাগ্রহ?*

পালনপুরি: আসলে কারণ মূলত আমরা নিজেরাই। একটু পেছনের দিকে তাকাও। আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রাহিমাহুল্লাহর সময়ও দেওবন্দে দাওরায়ে হাদিসে ছাত্র ছিল মাত্র ৩৫ জন। আর বর্তমানে সেখানে ছাত্র সংখ্যা ১৫০০। এই ছাত্র বৃদ্ধির বিষয়টা শুরু হয়েছে মাদানি রাহিমাহুল্লাহর সময় থেকে। কয়েক বছর আগেও পুরো মাদরাসায় ছাত্র ছিল কেবল ৮০০। আর বর্তমানে পুরো মাদরাসায় ছাত্র হয়ে গেছে ৪০০০। তো দিন দিন যে এতো ছাত্র বাড়ছে এর কারণ কী বলতে পারো?

জিজ্ঞাসা: *জি সম্ভবত ইলমের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে মানুষের, তাই ছাত্রও বাড়ছে সব জায়গাতেই।*

পালনপুরি: (হাসতে হাসতে) কী বললে তুমি? ইলমের প্রতি আগ্রহ? তো পূর্বের যুগে কি মানুষের মাঝে ইলমের প্রতি আগ্রহ ছিল না? না সব আগ্রহ কেবল তোমাদের এই বড় বড় মোবাইলের যুগেই?

জিজ্ঞাসা: *হয়তো আগেও আগ্রহ এমনই ছিল। বা কম বেশি হতে পারে। তবে আগে তো মানুষ সংখ্যায়ও কম ছিল। বর্তমানে মানুষের সংখ্যা বেশি। তাই ছাত্রও বেশি। এমন কিছু হতে পারে। তবে সঠিক জানি না।*

পালনপুরি: তোমার যুক্তি এক হিসেবে ঠিক আছে। তবে এটা মূল বিষয় নয়। বরং মূল বিষয় হলো অন্যটা। খেয়াল করে দেখো বর্তমান সময়ের ছাত্ররা মাদরাসায় কার আগ্রহে আসে? নিজ আগ্রহে নয়। মা-বাবার আগ্রহে। আর পূর্বেকার সময়ের ছাত্ররা তো মাদরাসায় আসতো নিজ আগ্রহে। ইলমের আগ্রহে। ফলে পড়ালেখায়ও উন্নতি হতো। কিন্তু বর্তমান সময়ের ছাত্রদের বিষয়টি এমন নয়।

তারা যেহেতু স্বেচ্ছায় আসছে না, বরং তাদের মা-বাবা মাদরাসায় দিয়ে যাওয়ার দরুন তারা মাদরাসায় পড়ে রয়েছে, তাই তাদের উন্নতিও হচ্ছে না। আর যে নিজ আগ্রহে আসেনি বা যার মাদরাসায় আসার পেছনে বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই তার লেখাপড়ার প্রতিই বা আগ্রহ আসবে কোত্থেকে? লেখাপড়ার প্রতি যার আগ্রহই নেই সে উন্নতিই বা করবে কোত্থেকে? তো এক্ষেত্রে এই স্বেচ্ছায় না আসাটাই অনাগ্রহ তৈরির মূল কারণ বলা চলে। ফলে বর্তমান সময়ে চাহিদানুপাতে ছাত্রদের মাঝে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জন হচ্ছে না।

জিজ্ঞাসা: *এই একটাই কি মূল কারণ যা কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জন না হওয়ার অন্তরায়?*

পালনপুরি: মূল কারণসমূহের মধ্যে একটা কারণ এটাও। তবে এটাই যে মূল কারণ তা তো বলিনি। মূল কারণের মধ্যে আরও কিছু বিষয় আছে। যেমন বর্তমানে পড়ালেখার গতি পাল্টে গেছে। উস্তাদরা ছাত্রদের থেকে সবক শুনেন না। এটাও একটা বিশেষ কারণ। পূর্বেকার সময়ে তো উস্তাদরা নিয়মিত সবক শুনতেন। সবক না পারলে ছাত্রদের লজ্জিত হতে হতো।

তখন ছাত্ররা এই লজ্জা পাওয়ার ভয়েই সবক শিখে ফেলতো। কিন্তু বর্তমানে আর সেই অবস্থা নেই। এখন তো সবক শুনতে চাওয়া উস্তাদদের জন্য লজ্জার কারণ। ফলে উস্তাদরাও সবক শোনেন না। তাই ছাত্ররাও সবক মুখস্থ করে না।

জিজ্ঞাসা: *আচ্ছা তাহলে এই যে উস্তাদরা সবক শোনেন না বা ছাত্ররা সবক মুখস্থ করে না– যেটাই বলি, এর দায়ভারটা মূলত কাদের? উস্তাদদের না ছাত্রদের?*

পালনপুরি: এর দায়ভার যাদেরই হোক না কেন, এমন একটি সমস্যা যে বিরাজমান তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই, তাই না?

জিজ্ঞাসা: *জি, এমন একটি বিষয় তো আমরা দেখেই আসছি। তবুও যদি একটু স্পষ্ট করতেন, এর দায়ভারটা মূলত কাদের? বা এমনটা কেন হচ্ছে? পূর্বে তো ছিল না এই সমস্যাটা। তো তখনই বা কেন ছিল না?*

পালনপুরি: আসলে তুমি তো আমাকে বিপদে ফেলে দিলে। আমি কাকে ছেড়ে কার ওপর দায়ভার চাপাবো? তবুও বলি দায়ভারের জায়গাটা মূলত এখানে খালি। মূল সমস্যা হলো পূর্বেকার সময়ে তো মাদরাসাগুলো ছোট ছোট ছিল। ছাত্র ছিল অল্প অল্প। তাই উস্তাদরা চাইলেই যে কাউকে সবক ধরতে পারতেন। কিন্তু বর্তমানে মাদরাসা হয়ে গেছে বড় বড়। তাই ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব নয় সবার সবক ধরা। তদুপরি নিয়মটা চালু থাকা দরকার।

একেবারে বন্ধ করে দিলে ছাত্ররা তো স্বাধীন হয়ে যাবে। তার চেয়ে যদি প্রতিদিনই কাউকে না কাউকে সবক ধরা হয় তাহলেও অন্তত সবার মাঝে এই ভীতিটা থাকবে। তখন সবাই অন্তত এই ভয়ে হলেও সবক ইয়াদ করবে যে, না জানি আজ কাকে সবক ধরে বসে!

জিজ্ঞাসা: *আরও কি কোনো কারণ আছে বলে মনে করেন? থাকলে কী হতে পারে সেগুলো?*

পালনপুরি: প্রথমেই তো বললাম কারণ আছে বহু। কয়টা বলবো? এখানে আলোচনার সুবাদে যা উঠে আসছে তাই তো বলছি। অন্য তো

আরও বহু কারণ রয়েছে। সেগুলোও নির্ণয় করা দরকার। যেমন বর্তমানে ছাত্রদের ইবারত পড়ার প্রচলন উঠে গেছে। ছাত্ররা ইবারত না পড়াটাও একটা মূল কারণ কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জন না হওয়ার পেছনে। তাই উচিত হলো প্রথম জামাত থেকে অন্তত শরহে বেকায়া পর্যন্ত সব জামাতে ইবারত পড়বে ছাত্ররা। তাহলেই কেবল লেখাপড়ার উন্নতি হবে। কিন্তু বর্তমানে তো এই নিয়ম কোথাও পাওয়া যায় না। এটা দুঃখজনক।

জিজ্ঞাসা: *হুযুর আপনি বললেন ছাত্ররা ইবারত পড়ে না। কিন্তু আমরা তো দেখি সব জায়গাতেই শরহে বেকায়া পর্যন্ত তো ছাত্ররা ইবারত পড়েই এমনকি শরহে বেকায়ার পরও একদম দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত বা এরপরও তাখাসসুসাত ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই ইবারত তো ছাত্ররাই পড়ে। তাহলে এ বিষয়টিকে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জন না হওয়ার পেছনে অন্তরায় ধরাটা কেমন?*

পালনপুরি: আহহা! তুমি ইবারত পড়ার অর্থটাই বোঝোনি। ইবারত পড়ার দ্বারা সম্ভবত তুমি বোঝেছো আমাদের বর্তমান সময়ে ইবারত পড়ার প্রচলিত নিয়ম। কিন্তু ইবারত পড়ার দ্বারা মূল উদ্দেশ্য কী সেটা তাহলে তুমি জানোই না। ইবারত পড়ার মানে হলো, ইবারত পড়াসহ তরজমা করা, তাশরিহ করা সবই ছাত্রের দায়িত্ব। উস্তাদ শুধু শুনবেন এবং ভুল হলে বলে দেবেন। এছাড়া আর কিছুই করবেন না। এই নিয়মটা আগে ছিল কিন্তু বর্তমানে নেই। আর ইবারত পড়ার মূল মাকসাদ এটাই। কিন্তু এই নিয়ম এখন কোথায় আছে বলো তুমি?

জিজ্ঞাসা: *জি হুজুর, আমি এবার বুঝতে পেরেছি বিষয়টি। তবে এ বিষয়টি যদিও ব্যাপকভাবে নেই, তবে কিছু কিছু জায়গায় আছে। যেমন– আমি বাংলাদেশে থাকতে যে মাদরাসায় পড়েছি সেটা ঢালকানগর মাদরাসা নামে পরিচিত। সেই মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা জাফর আহমাদ সাহেব দা.বা. যিনি করাচি হজরতের খলিফা। সম্ভবত আপনি চিনেনও তাকে। আপনাকে গত বছর সেই মাদরাসায় একটি প্রোগ্রামে দাওয়াতও করা হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ কোনো কারণে হয়তো আপনি যেতে পারেননি। সেই মাদরাসায় একজন উস্তাদ আছেন*

যাকে নেত্রকোণা হুযুর বলা হয়। অই নেত্রকোণা হুযুর আমাদের এভাবে পড়াতেন। অনেক উপকার পেয়েছিলাম এই পদ্ধতিতে পড়ে।

পালনপুরি: আমি চিনি মাওলানা জাফর আহমাদ সাহেবকে। অনেক ভালো মানুষ তিনি। তাকে অনেক মহব্বতও করি আমি। তবে তুমি যেটা বললে যে, ওই মাদরাসায় এই নিয়ম আছে তা মানলাম। তবে সেটাও তো কেবল একজন উস্তাদের কথা বললে। সবাই তো আর এরকমভাবে পড়াচ্ছেন না, তাই না? তো দু-একজন নিয়মটা চালু রাখলেও তো বৃহৎ ক্ষতি যেটা হওয়ার, সেটা কী আর বন্ধ থাকবে? তো ক্ষতি যেটা চালু রয়েছ সেটা চালু থাকবেই।

***জিজ্ঞাসা:** জি অবশ্যই। তো হুজুর, সংক্ষেপে আরও কিছু মৌলিক কারণ যদি বলতেন!*

পালনপুরি: দেখো বর্তমান সময়ে ছাত্রদের মাঝে মুতালায়ার অভ্যাস কমে গেছে। ছাত্ররা মুতালায়া করে দরসে আসে না। মুতালায়া না করলে কখনও কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জন হবে না। এরপর ছাত্রদের মাঝে উস্তাদদের প্রতি শ্রদ্ধা কমে গেছে।

ছাত্ররা উস্তাদদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা বজায় না রাখতে পারলেও কিন্তু কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জন হবে না। কারণ ইলম হলো সিনা-বাসিনা। এখন উস্তাদের সিনা থেকে যদি ছাত্রের সিনায় ইলম নিতেই হয় তাহলে উস্তাদের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা বজায় রাখা জরুরি। এরপর তাকরারের গুরুত্ব কমে গেছে ছাত্রদের মাঝে। তাকরার করাও অনেক উপকারী যোগ্যতা অর্জনের জন্যে। এরপর দরসে ছাত্ররা উস্তাদদের বলা কথাগুলো নোটও করে না ঠিক মতো। দরসে উস্তাদের কথা নোট করারও ফায়দা অনেক। এরপর ছাত্ররা সবক মুখস্থ করে না তাতো বললামই। এর জন্য মূল কারণ তারাই, যে সবক ধরা হয় না।

সবক ধরা হলেই ছাত্ররা সবক মুখস্থ করতো। আর নিয়মিত সবক মুখস্থ করলে যোগ্যতা তার হবেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

***জিজ্ঞাসা:** হুযুর আপনি বলেছিলেন- ছাত্রদের মাঝে লেখাপড়ার প্রতি অনাগ্রহের কারণে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা তৈরি হচ্ছে না। তো এই অনাগ্রহ তৈরির পেছনে বিশেষ আর কোনো কারণ আছে কি না আপনার মতে?*

পালনপুরি: হ্যাঁ, আছে। বর্তমান সময়ে মারপিট করার একটি প্রবণতা আছে অনেক মাদরাসায়। এই মারপিট একটা ক্ষতিকর দিক। মারপিট করে মূলত কোনো ফায়দা হয় না। বা ফায়দা যতটুকুই হোক ক্ষতি তার চেয়ে বেশি। কেননা একটা ছাত্র যখন প্রায় প্রায়ই মার খেতে থাকবে তখন সে অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। ফলে ইলমের প্রতি তার অজান্তেই একটা অনাগ্রহ তৈরি হয়ে যাবে। তখন সে লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে যাবে। সে ভাববে আমি কিছু পারি না। তাই সে পড়বেও না। এভাবে সময় কেটে যাবে কিন্তু তার যোগ্যতা বা দক্ষতা আর অর্জন হবে না।

***জিজ্ঞাসা:** মারপিট তো হুযুর উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে করা হয়। যেসব ছাত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না তাদেরই তো মারপিট করা হয়। তাহলে এখন যদি মারপিটই বন্ধ করে দেওয়া হয়, তো যাদের নিয়ন্ত্রণ করতে কষ্ট তাদের কীভাবে কী করবেন উস্তাদরা?*

পালনপুরি: যদি কোনো ছাত্র উচ্ছৃঙ্খল হয় আর উস্তাদ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন তাহলে মুহতামিম সাহেবের শরণাপন্ন হবেন। মুহতামিম সাহেবও যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তাহলে তিনি তার গার্ডিয়ানকে খবর দেবেন। সে তার গার্ডিয়ানের কথাও যদি না মানে তাহলে গার্ডিয়ান তাকে অন্য মাদরাসায় ভর্তি করে দেবেন। ব্যস, সমাধান।

***জিজ্ঞাসা:** কেন হুজুর? অন্য মাদরাসায় ভর্তি করলে কী ফায়দা? তার অভ্যাস তো থেকেই যাবে। কথা তো একই। উচ্ছৃঙ্খলতা এখানেও করবে ওখানেও করবে। তাহলে অন্য মাদরাসায় ভর্তি করার মাকসাদ কী?*

পালনপুরি: শোনো হাদিসে হুবহু এরকমই একটি ঘটনা আছে। ঘটনাটি হলো- যদি কারও মালিকানাধীন কোনো ক্রীতদাসি ব্যভিচার করে তাহলে তাকে ব্যভিচারের শাস্তি দাও। দ্বিতীয় বার যদি করে আবারও শাস্তি দাও। এরপর তৃতীয় বারও করলে আবার শাস্তি দাও। চতুর্থ বার যদি করে তাহলে তাকে বিক্রি করে দাও। এখন বলো- চারবার সে এখানে ব্যভিচার করলো। তো তাকে বিক্রি করে কী ফায়দা হবে? সে তো অন্যের মালিকানায় গিয়েও ব্যভিচার করবে। নাকি সে শুধরে যাবে?

কোনটা? তাকে যে বিক্রি করতে বলা হলো এর কারণ কী? সে অন্যের মালিকানায় গেলেই কি তার অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে যাবে? বলো কী কারণে হাদিসে তাকে বিক্রি করে দিতে বলা হয়েছে?

জিজ্ঞাসা: *তা তো বলতে পারি না। হুজুর, আপনিই যদি বুঝিয়ে দিতেন বিষয়টি!*

পালনপুরি: শোনো! যুক্তি তো চলেই যে অন্যের মালিকানায় গেলেই কি সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু বিক্রির দ্বারা এখানে অন্যের মালিকানায় গিয়ে শুধরে যাওয়া মাকসাদ না। মাকসাদ ভিন্ন কিছু। অর্থাৎ– এখানে মূল মাকসাদ হলো, বর্তমান মালিক তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। তাই বিক্রি করে দিতে বলা হয়েছে। যাতে অন্য মালিক তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। হুবহু ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি এমনই। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো ছাত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তাহলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের উচিত গার্ডিয়ানকে ডেকে বুঝিয়ে দেওয়া যে– তাকে যেন অন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দেওয়া হয়। যাতে অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

জিজ্ঞাসা: *বর্তমান সময়ে লেখাপড়ার পেছনে এই অনাগ্রহের মূল কারণ কী?*

পালনপুরি: মূল কারণ তো ধরা যায় না, তবে বিশেষ একটি সমস্যা হলো বর্তমান সময়ের মোবাইল। ছোট-বড় যেটাই হোক মোবাইল বলতেই ক্ষতিকারক। মোবাইলের ব্যাপারে কঠোর থেকে কঠোর হওয়া উচিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের। ছাত্ররা তো এখন সকালে ঘুম থেকে উঠেই মোবাইল খোঁজে। কিতাব খোঁজে না। সকালে উঠেই মোবাইল নিয়ে দেখে কে কে কল দিলো? কে কে ম্যাসেজ দিলো? কিতাবের পরিবর্তে মোবাইল তাদের নিত্যসঙ্গী।

আগের জামানায় মোবাইল ছিল না। ফলে তখন ছাত্রদের মাঝে ইলমের প্রতি আগ্রহ ছিল। বর্তমান সময়ে মোবাইলই ছাত্রদের ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন তো ছাত্রদের আগ্রহ মাত্র একটাই। মোবাইলই তাদের সবকিছু। এই মোবাইলের ব্যাপারে ছাত্রদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো উচিত। তাই মোবাইলের ব্যাপারে যত কঠিন থেকে কঠিন ব্যবস্থা

নেওয়া হবে ততই ফায়দা। মোবাইল ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা দরকার। নেটওয়ালা মোবাইল তো চালাতে পারবেই না ছাত্ররা। এমনকি ছোট মোবাইলও চালাতে পারবে না।

মোবাইল বলতেই ক্ষতিকারক। তাই কর্তৃপক্ষের উচিত এই একটি বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা। এই মোবাইলই সব সমস্যার মূল উৎস। মোবাইল চালানো বন্ধ করলেই অনেক সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। মোটকথা মোবাইল চালানো যাবেই না। যদি শুধু এই মোবাইলটা বন্ধ করা যায় তাহলে দেখবে সবক্ষেত্রে উন্নতি হবে। লেখাপড়া, আমল-আখলাক, নামাজ-কালাম ও মুয়ামালা-মুয়াশারা সবকিছু নিয়ম মাফিক চলবে। একমাত্র এই মোবাইল রোধ করতে পারলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। ছাত্রদের ধ্বংসের একমাত্র উপকরণ এই মোবাইলই।

জিজ্ঞাসা: *ছাত্রদের মাঝে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জনের জন্য মাদরাসা কর্তৃপক্ষের বিশেষ কোনো করণীয় আছে?*

পালনপুরি: বিশেষ করণীয় বলতে আর কী? অনেক বিষয়ই তো বললাম। তবে একটি বিষয় বলা হয়নি। সেটাই বলি। মাদরাসা কর্তৃপক্ষের উচিত ছাত্র-সংখ্যানুপাতে উস্তাদ নিয়োগ দেওয়া। যাতে উস্তাদরা ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। মাদরাসাগুলোর তো বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে, মাদরাসায় প্রথমে উস্তাদ নিয়োগ দেওয়া হয় ২৫-৩০ জন। এরপর ছাত্র ভর্তি নেওয়া শুরু হয়। এখন ছাত্রসংখ্যা যদি ২০০ হয় তাহলেও এই উস্তাদরাই পরিচালনা করেন, আবার ছাত্রসংখ্যা ২০০০ হলেও এই উস্তাদরাই পরিচালনা করেন। তো যখন ছাত্রসংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে যায় তখন ছাত্ররা আর নিয়ন্ত্রণে থাকে না উস্তাদদের।

আর ছাত্ররা যদি উস্তাদদের নিয়ন্ত্রণেই না থাকে তো ছাত্ররা উস্তাদদের থেকে কী ফায়দা হাসিল করবে? আর ছাত্রদের কী যোগ্যতা তৈরি হবে? তাই মাদরাসা কর্তৃপক্ষের উচিত ছাত্রসংখ্যানুপাতে উস্তাদ নিয়োগ দেওয়া।

জিজ্ঞাসা: শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে আপনার বিশেষ কোনো মূল্যায়ন থাকলে বলুন!

পালনপুরি: শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে মূল বিষয় তিনটি। এই তিনটি বিষয়ের ওপরই তালিম নির্ভরশীল।

প্রথম হলো– উস্তাদের ইলমি যোগ্যতা। **দ্বিতীয় হলো–** ছাত্রের নিরলস মেহনত। **তৃতীয় হলো–** নিখুঁত সিলেবাস। আবার ওই তিনটি বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রথম দুটি। কেননা যদি উস্তাদের ইলমি যোগ্যতাই কম থাকে, তাহলে সুন্দর সিলেবাসে কী আসে যায়? শিক্ষার উন্নতি হবেই না বলতে পারি। আবার যদি উস্তাদের যোগ্যতা থাকে কিন্তু ছাত্রের মেহনত নেই তাহলেও ফায়দা নেই। সুতরাং বলা যেতে পারে যে– তিনটি বিষয়ের মধ্যে তৃতীয়টি প্রথম দুটির ওপর নির্ভরশীল। প্রথম দুটি যথাযথভাবে পাওয়া গেলেই কেবল তৃতীয়টি কাজে আসবে। নতুবা নয়।

জিজ্ঞাসা: তো এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

পালনপুরি: তোমাদের কোনো করণীয় নেই। মূল করণীয় হলো প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের। সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষেরই উচিত অন্তত পক্ষে *শরহে বেকায়া* পর্যন্ত হলেও যোগ্যতাসম্পন্ন উস্তাদ নিয়োগ দেওয়া এবং মেহনতকারী ছাত্র ভর্তি নেওয়া। উভয়টি হয়ে গেলে এবার সিলেবাসকে উপযুক্তকরণের ফিকির করা। তাহলেই কেবল তালিমটা ফলপ্রসূ হবে।

জিজ্ঞাসা: সবাই তো যোগ্যতাসম্পন্ন উস্তাদই নিয়োগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যোগ্যতার মানদণ্ডটা কী? সেটা জানতে চাই!

পালনপুরি: নাহ! কে বলেছে তোমাকে সবাই যোগ্যতাসম্পন্ন উস্তাদই নিয়োগ দিয়ে থাকেন? এটা তোমার একটি ভুল ধারণা। আরে বর্তমানে তো মাদরাসাগুলোর অবস্থা হলো তারা খোঁজে কার বেতনের চাহিদা সবচেয়ে কম? তাকেই সবাই নিয়োগ দিতে উঠে পড়ে লাগে। কার যোগ্যতা কত বেশি অধিকাংশ লোকই তা খোঁজে না। এমনকি যাকে নিয়োগ দেওয়া হলো তার যোগ্যতা কতটুকু তাও একটিবার ভাবে না। বাস্তবতা তো এটাই যে, অধিকাংশ লোকই যোগ্যতার বিচারে উস্তাদ

নিয়োগ দেয় না। নিয়োগ দেয় বেতনের বিবেচনায়। আর যোগ্যতার মানদণ্ডের কথা বললে না? যোগ্যতার মানদণ্ড হলো– যে উস্তাদ যে কিতাব পড়ান সেই উস্তাদের অন্তত পক্ষে সেই কিতাবটা ফার্স্ট টু লাস্ট ইয়াদ থাকা। নতুবা তাকে যোগ্যতাসম্পন্ন ধরা হবে না।

জিজ্ঞাসা: কোনো উস্তাদ কিতাবের যে অধ্যায় যখন পড়াবেন তার তখন সেই অধ্যায় মুখস্থ থাকলেই তো হলো। পুরো কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ না থাকলে ক্ষতি কী?

পালনপুরি: শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ থাকার ব্যাপারে যেটা বলেছি সেটা তো হলো যোগ্যতার মানদণ্ডের কথা। আর ক্ষতি হলো যদি কোনো উস্তাদের পুরো কিতাব ইয়াদ না থাকে, তাহলে ছাত্ররা তার থেকে সঠিকভাবে ফায়দা পাবে না। কেননা কিতাবের অনেক মাসয়ালা থাকে যা পূর্বের বা পরের সাথে সম্পৃক্ত। তো যখন কোনো মাসয়ালা তার পরবর্তী অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে তখন তো প্রথম দিকে মাসয়ালাটি অস্পষ্ট থাকবে। তখন তো ছাত্রদের বিভিন্ন এশকাল থাকতে পারে মাসয়ালাটির ওপর।

তো উস্তাদ তখন কী উত্তর দেবেন ছাত্রদের? আর যদি উস্তাদের ইয়াদ থাকে কিতাব তাহলে তো তিনি সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হবেন। সুতরাং উস্তাদের ক্ষেত্রে যোগ্যতার মানদণ্ডই হলো কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইয়াদ থাকা।

জিজ্ঞাসা: এ তো গেল উস্তাদের যোগ্যতার কথা। ছাত্রদের মাঝে মেহনতের মেজাজ তৈরির ব্যাপারে উস্তাদের কি কোনো করণীয় আছে? থাকলে কী? না থাকলে ছাত্রদের মাঝে মেহনতের মেজাজ তৈরির পদ্ধতি কী?

পালনপুরি: ছাত্রদের মাঝে মেহনতের মেজাজ তৈরি ব্যাপারে করণীয় উস্তাদেরই। ছাত্রের জন্য জরুরি কেবল মনোযোগী হওয়া। বাকি কাজ উস্তাদের। উস্তাদ মাসয়ালা ও মাসায়েলগুলো সহজ ও সুন্দরভাবে ছাত্রের সামনে পেশ করবেন। তো ছাত্রের মাঝে যখন ইলমের আগ্রহ না থাকবে তখনও সে যখন মাসয়ালা-মাসায়েলগুলো সহজেই বুঝতে সক্ষম হবে।

ফলে ইলমের প্রতি তার একটা আগ্রহ তৈরি হবে। আর আগ্রহটা তৈরি হয়ে গেলেই সে মেহনতি হয়ে যাবে। আর যদি তার জন্য মাসয়ালাগুলো বোঝা কঠিন হয় তাহলে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। ফলে ইলমের প্রতি তার অনাগ্রহ আরও বাড়বে। তখন সে মেহনত করা একদমই ছেড়ে দেবে। তাই উস্তাদরা যত সুন্দর ও সহজভাবে মাসয়ালা-মাসায়েলগুলো উপস্থাপন করবেন ছাত্রদের মাঝে ইলমের অগ্রহ ও মেহনত ততই বাড়বে।

জিজ্ঞাসা: ছাত্রদের মাঝে মেহনতের মেজাজ বৃদ্ধির আরও কোনো উপায় থাকলে যদি বলতেন!

পালনপুরি: উপায় বলে তো শেষ করা যাবে না। কিন্তু দুই একটা যাই বলা হয় তাও তো আমলে আসে না। আমলে আনলে তো আসলে দুই একটা উপায়ই অনেক ফায়দা দিতো। যেমন ছাত্রদের মাঝে মেহনতের মেজাজ তৈরির ব্যাপারে আমি প্রায়ই বলে থাকি ছাত্রদের বেশি বেশি আকাবিরের ইলমি ঘটনাবলি শোনাতে। এমন এমন ঘটনা শোনাতে হবে যার দ্বারা ছাত্ররা প্রভাবিত হয় বেশি। তো যখন আকাবিরের ইলমি ঘটনাবলির প্রভাব ছাত্রদের মাঝে পড়বে তখন ছাত্রদের মাঝে অটোমেটিকই মেহনতের মেজাজ তৈরি হয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা: আচ্ছা তাহলে তৃতীয় যে বিষয়টি ছিল নেসাব বা সিলেবাস– এ ব্যাপারে কিছু শুনতে চাই!

পালনপুরি: নেসাব বা সিলেবাসের কথা তো প্রথমেও বলেছি, এটা আকাবিরের ধারায়ই থাকবে। তবে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে কিছুটা আধুনিকায়নও করতে হবে। নতুবা সমাজ আমাকে গ্রহণ করবে না। যুগ চাহিদার কোনো কমতি যদি থেকে যায় তাহলে সমাজ তো আমাকে ঠেলে দেবেই। তাই আকাবিরের ধারাকে বজায় রেখেই নেসাব আরও উপযুক্ত করার প্রয়াস চালানোও খুব প্রয়োজন।

জিজ্ঞাসা: হুযুর আপনার লম্বা সময় নষ্ট করলাম। সময় দেওয়ার জন্য শুকরিয়া।

পালনপুরি: জাযাকাল্লাহ তোমাকে। শিক্ষা-দীক্ষা বিষয়ক কথাগুলো তোমরা খেদমতের লক্ষ্যে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবে জেনে খুশি হলাম। ঠিক আছে তাহলে। ভালো থাকো। আর আমার শারীরিক অবস্থার জন্য দোয়ার দরখাস্ত রইলো সবার কাছে।

পীর-মুরিদি সম্পর্কে তাঁর মতামত

পীর-মুরিদি সম্পর্কে মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রাহিমাহুল্লাহ বেশ শক্ত অবস্থানে ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি আমাদের দাওরায়ে হাদিস জামাতে বুখারি শরিফ পাঠদানের সময় এক আলোচনার সূত্র ধরে এক পর্যায়ে বলেন– আজকে পীর মুরিদির অবস্থা খুবই নাজুক। এক বাক্যে বলা যেতে পারে, সাম্প্রতিক পীর-মুরিদি মানেই হলো দোকানদারি।

আজকাল পীর-মুরিদির নামে চলছে সর্বত্র রমরমা বিজনেস। সত্যিকারার্থে পীর বা বুজুর্গ পাওয়া আজকাল খুবই দুষ্কর বিষয়। জান্নাতে যেতে কখনও মুরিদ হওয়া শর্ত নয়। তবে হ্যাঁ, জান্নাতের উঁচু মর্যাদার অধিকারী হতে হলে অবশ্যই কোনো না কোনো খাঁটি আল্লাহর ওলির কাছে মুরিদ হওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখনকার কথিত সুন্নি, বেরলভি এবং বেদাতিদের মতে 'যেকোনো পীরের কাছে মুরিদ হওয়া ফরজ; যার পীর নেই তার পীর হলো শয়তান'– তাদের এরকম ভ্রান্ত মতবাদের কোনো ভিত্তি নেই। এসব কথা মনগড়া বৈ কিছুই না। কারণ, কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম ছাড়া সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইয়াতে সুলুক হননি।

আবার কথিত আহলে হাদিস লা-মাজহাবিদের মতে 'ইসলামে পীর-মুরিদির কোনো অস্তিত্ব নেই' এটাও সম্পুর্ণরূপে সঠিক নয়। কারণ, কিছুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বায়য়াত হয়েছেন। সেটা কুরআন-হাদিস দ্বারা অবশ্যই প্রমাণিত।

তাই এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং উলামায়ে দেওবন্দের অভিমত হলো, মুরিদ হওয়া ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক) নয় বরং বড়জোর সুন্নতে মুস্তাহাব্বাহ্। যেমন উলামায়ে দেওবন্দের আরও কিছু উক্তি উল্লেখ করছি। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কারও কাছে বায়য়াত হওয়া সুন্নাত, (মুস্তাহাব) ওয়াজিব নয়।[৪০]

মাওলানা মুফতি রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুরিদ হওয়া ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব।[৪১]

---

৪০. কিফায়াতুল মুফতি: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮০
৪১. ফাতাওয়া রশিদিয়া: পৃষ্ঠা ২০২

মুফতিয়ে আজম মাওলানা কিফায়তুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রচলিত ধারায় কোনো শায়খের কাছে বায়য়াত হওয়া আবশ্যক নয়, বড়জোর মুস্তাহাব।[৪২]

তিনি বলেন– পীর ফার্সি শব্দ। আরবিতে এটাকে বলা হয় মুরশিদ। অর্থ হলো পথপ্রদর্শক। অর্থাৎ যিনি আল্লাহর আদেশ নিষেধ এবং আল্লাহর পছন্দনীয় পন্থায় চলার পথ নির্দেশ করেন। এমনিভাবে মুরিদ শব্দটিও আরবি। অর্থ হলো ইচ্ছা পোষণকারী। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ নিষেধ এবং আল্লাহ তায়ালা যেভাবে চান সেভাবে তার আদেশ-নিষেধ পালনের ইচ্ছা পোষণ করে কোনো হক্কানি বুজুর্গ ব্যক্তির হাত ধরে শপথ করেন।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা থেকে একথা স্পষ্ট হলো, পীর হবেন শরিয়তের আদেশ নিষেধ পালন করার প্রশিক্ষণদাতা। আর যিনি সে প্রশিক্ষণ নিতে চান তার নাম 'মুরিদ'। যে ব্যক্তি নিজেই শরিয়তের বিধান অমান্য করে, নামাজ পড়ে না, পর্দা করে না, সতর ঢেকে রাখে না বা শরিয়তের আবশ্যকীয় কোনো বিধি-বিধানই পালন করে না, সে ব্যক্তি কিছুতেই পীর বা মুরশিদ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

কারণ স্পষ্ট, যার নিজের মাঝেই শরিয়ত নেই, সে কীভাবে অন্যকে শরিয়তের ওপর আমল করার প্রশিক্ষণ দেবে বা দেওয়ার অধিকার রাখবে। মূলত সে নিজেই প্রশিক্ষিত নয়।

লক্ষণীয়, পীর মুরিদির এই পদ্ধতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই চলে আসছে। নবীজি সাহাবাদের আল্লাহমুখী হওয়ার প্রশিক্ষণ দিতেন। সাহাবারা নবীজির কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিতেন। বলা যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সবচেয়ে প্রথম ও বড় পীর আর সাহাবায়ে কেরাম হলেন প্রথম মুরিদ।

বর্ণিত হয়েছে, হে মুমিনেরা! আল্লাহকে ভয় করো, আর সৎকর্মপরায়নশীলদের সাথে থাকো।[৪৩]

৪২. কিফায়াতুল মুফতি: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৫

৪৩. সুরা তাওবা: আয়াত ১১৯

উপরের আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বুজুর্গদের সাহচর্যে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপর আয়াতে এসেছে, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা নেয়ামত দিয়েছেন, তারা হলেন নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ ও নেককার বান্দাগণ।[৪৪]

এসব আয়াত একথাই প্রমাণ করছে যে, নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা হলেন নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ, নেককারগণ, আর তাদের পথই সরল সঠিক তথা সিরাতে মুস্তাকিম। অর্থাৎ তাদের অনুসরণ করলেই সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর চলা হবে।

হাদিসে পাকে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– সৎসঙ্গ আর অসৎ সঙ্গের উদাহরণ হচ্ছে মেশক বহনকারী আর আগুনের পাত্রে ফুঁকদানকারীর মতো। মেশক বহনকারী হয় তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তুমি নিজে কিছু কিনবে। আর যে ব্যক্তি আগুনের পাত্রে ফুঁক দেয় সে হয়তো তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দেবে, অথবা ধোঁয়ার গন্ধ ছাড়া তুমি আর কিছুই পাবে না।[৪৫]

৪৪. সুরা নিসা: আয়াত ৬৯

৪৫. বুখারি, হাদিস নং ৫২১৪: সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৮৬০: মুসনাদুল বাজ্জার, হাদিস নং ৩১৯০; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮৩১

সদরে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, দারুল উলুম দেওবন্দের নির্বাহী মুহতামিম হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ

কারী উসমান মানসুরপুরি রাহিমাহুল্লাহ

আল্লামা সাইয়্যিদ কারী মুহাম্মদ উসমান মানসুরপুরি রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহিমাহুল্লাহুর জামাতা, দারুল উলুম দেওবন্দের নির্বাহী মুহতামিম ও মুহাদ্দিস এবং অল ইন্ডিয়া মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াতের প্রধান। দৈহিক সৌন্দর্য, চারিত্রিক গুণাবলী, সৌজন্যবোধ, বংশীয় আভিজাত্য, খোদাভীতি ও পূতপবিত্রতার সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দান করেছিলেন সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত এক জীবনাচার। ছাত্রদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন ও তাদের বিপদে পরম বন্ধুর মতো পাশে থাকা ছিল তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। নিয়মানুবর্তিতা ছিল তাঁর স্বভাবজাত বিষয়।

জন্ম ও জন্মস্থান

১৯৪৪ সালের ১২ই আগস্ট মুজাফফরনগর জেলার মানসুরপুরের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা নবাব সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ ঈসা রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি একজন খাঁটি ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন। ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ সম্মান ও বিশ্বাস। তাঁর কাছে শরিয়তবিরোধী কাজের কোনো স্থান ছিল না। সন্তানদের ইলম ও আমলের পথে পরিচালিত করার প্রচণ্ড ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল নবাব মুহাম্মদ ঈসা রাহিমাহুল্লাহুর। তাই সন্তানদের ইলমে দীন শিক্ষার খাতিরে তিনি বাড়ি ছেড়ে দেওবন্দ এলাকায় চলে আসেন। ১৯৬৩ সালে তিনি দেওবন্দেই ইন্তেকাল করেন। মাকবারায়ে কাসিমিতে নবাব ঈসা রাহিমাহুল্লাহুকে দাফন করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার্জন

হযরত কারী উসমান মানসুরপুরি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁর মরহুম বাবার কাছেই পবিত্র কুরআন শরিফ হিফজ সমাপ্ত করেন। এরপর ফার্সি জামাত থেকে শুরু করে দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত পরিপূর্ণ পড়াশোনা তিনি দারুল উলুম দেওবন্দেই শেষ করেছেন। শিক্ষাজীবনে সবসময় তিনি ঈর্ষণীয় ফলাফল করতেন। ১৯৬৫ সালে দেওবন্দে দাওরায়ে হাদিস পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান লাভ করেন।

উচ্চশিক্ষা ও খেলাফত লাভ

১৯৬৬ সালে কারী হিফজুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ ও কারী আতীক রাহিমাহুল্লাহুর কাছে কেরাত ও তাজবিদ বিষয়ে শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ করেন। এরপর প্রখ্যাত আদিব মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানভি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে আমিরুল হিন্দ, ফিদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আসআদ মাদানি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে সুলূক ও মারেফাতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে খেলাফত ও ইজাজত লাভে ধন্য হন।

কর্মজীবন ও সাংগঠনিক কার্যক্রম

শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করার পর তিনি বিহারের জামিয়া কাসিমিয়াতে পাঁচ বছর এবং জামিয়া ইসলামিয়া জামে মসজিদ আমরুহায় এগারো বছর অধ্যাপনা করেন। বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিষয়াদির কিতাব পাঠদানের পাশাপাশি একই সাথে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের প্ল্যাটফর্মে থেকে তাঁর জনসেবামূলক সামাজিক কাজও অব্যাহত রাখেন। ১৯৭৯ সালে ফিদায়ে মিল্লাত সাইয়্যিদ আসআদ মাদানি রাহিমাহুল্লাহুর নেতৃত্বে 'দেশ বাঁচাও, জাতি বাঁচাও' আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং তিনি দশ দিন তিহার জেলে আটক ছিলেন। এরপর জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের মজলিসে আমেলার অন্যতম প্রধান সদস্য নির্বাচিত হন। ফিদায়ে মিল্লাত সাইয়্যিদ আসআদ মাদানি রাহিমাহুল্লাহুর ইন্তেকালের পর তিনি সংগঠনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে

জমিয়তকে সামনে এগিয়ে নেন। মজলিসে আমেলা ২০০৮ সালের ৬ই মার্চ তাঁকে প্রথমে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং পরে ৫ই এপ্রিল ২০০৮ সালে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সভাপতি নির্বাচিত করে। আমৃত্যু তিনি এই মহান দায়িত্ব ও খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

হযরত কারী উসমান মানসুরপুরি রাহিমাহুল্লাহুর নেতৃত্বে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ দেশের আনাচে-কানাচে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ইসলামের শান্তির পয়গাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে দিল্লি ও দেওবন্দে 'আমনে আলম কনফারেন্স' বা বিশ্ব শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করে।

তিনি প্রতিনিয়ত ভারতের সব দলকে এক মঞ্চে একত্রিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। সে লক্ষ্যেই জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ ২০১৯ সালে এক অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দকে একই মঞ্চে উপস্থিত করে। অনুরূপ ২০১৭ সালে তাঁর নেতৃত্বে ভারতের এক হাজার শহরে একসাথে 'আমান মার্চ' বা শান্তি র‍্যালি বের হয়।

[বাংলাদেশেও তিনি ২০১১ সালে তৎকালীন স্পিকার ও বর্তমান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদের উপস্থিতিতে ইসলামি গবেষণা পরিষদ আয়োজিত **'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি: আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য'** শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে দেওবন্দ ও জমিয়তের পক্ষ থেকে যোগ দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শাইখুল হাদিস জাকারিয়া রাহিমাহুল্লাহুর অন্যতম খলিফা শায়খ আবদুল হাফিজ মাক্কি রাহিমাহুল্লাহ এবং সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জমিয়তুল উলামার চেয়ারম্যান আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ হাফিজাহুল্লাহ]

এছাড়া আল্লামা সাইয়্যিদ কারী মুহাম্মদ উসমান মানসুরপুরি মুসলিমদের মাঝেও আভ্যন্তরীণ ঐক্য তৈরির লক্ষ্যে ব্যাপক কাজ করেছেন। ২০১১ সালে গোত্রকেন্দ্রিক সংঘাতের বিল ও সংখ্যালঘু মুসলিমদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে 'দেশ বাঁচাও, জাতি বাঁচাও' আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। লক্ষ্মৌতে সশরীরে মাঠে-ময়দানে উপস্থিত ছিলেন।

২০১৬ সালে আজমির শরিফে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের ৩৩তম সাধারণ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। যেখানে মুসলমানদের দুই পক্ষ একত্রে একই মঞ্চে অবস্থান নেয় এবং বিশ্বব্যাপী ঐক্যের পয়গাম তুলে ধরে। দিল্লি, কাশ্মীর, মুজাফফর নগর, আসাম, বিহার ইত্যাদি দাঙা কবলিত এলাকায় মুসলমানদের সেবাশুশ্রূষা ও সাহায্য সহযোগিতায় সশরীরে সামনের কাতারে থেকে নিজেকে বিলিয়ে দেন।

২০১০ সালে দেওবন্দের তৎকালীন মুহতামিম মাওলানা মারগুবুর রহমান সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর ইন্তেকালের পর থেকে তাঁকে ইমারাতে শরিয়ায়ে হিন্দের অধীনে আমিরুল হিন্দ নির্বাচিত করা হয়।

১৯৮২ সাল থেকে দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষকতা করার পাশাপাশি মাদরাসার বিভিন্ন ব্যবস্থাপনাগত দায়িত্বও আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর দরস ছিল অহেতুক-অনর্থক হাস্যরস থেকে মুক্ত, অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ। খুব পরিষ্কার ভাষায় আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গিতে বোঝাতেন তিনি। অনুবাদ করতেন প্রাঞ্জল ভাষায়।

১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাসে 'আন্তর্জাতিক খতমে নবুওয়াত সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়, তিনি ছিলেন এর আহ্বায়ক। এরই মধ্য দিয়ে 'অল ইন্ডিয়া মজলিসে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত' প্রতিষ্ঠা পায় এবং তিনি এর সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সংগঠনটি ভারতের কাদিয়ানি ফিতনার বিরুদ্ধে অনেক কাজ করেছে। যা দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাসে এক সোনালি অধ্যায় হয়ে থাকবে। এসবই হলো তাঁর ঈমানি চেতনার প্রতিক্রিয়া ও অনিঃশেষ প্রাণশক্তির প্রচেষ্টার ফসল।

এতো সব দায়িত্ব পালন করেও ১৯৯৯ সাল থেকে নিয়ে ২০১০ সাল পর্যন্ত দারুল উলুম দেওবন্দের নায়েবে মুহতামিমের দায়িত্বও সফলভাবে আঞ্জাম দেন হযরত উসমান মানসুরপুরি রাহিমাহুল্লাহ। ২০২০ সালে দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শুরা তাঁকে নির্বাহী মুহতামিম হিসেবে নির্বাচিত করে। বিগত রমজান মাসে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। কাজের চাপ ও বিভিন্ন ধরনের ব্যস্ততার দরুন তাঁর বড় আকারে রচিত

কোনো গ্রন্থ নেই, তবে তাঁর লেখা প্রবন্ধ ও পুস্তিকাগুলো পড়লে বোঝা যায় রচনাশৈলিতেও তাঁর চমৎকার দক্ষতা ছিল।

বিয়ে ও সন্তানাদি

১৯৬৬ সালে তিনি শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহিমাহুল্লাহুর কন্যার সঙ্গে সুন্নত মোতাবেক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা জাকারিয়া কান্ধলবি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর বিয়ে পড়িয়েছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে তিনি দুই ছেলে ও এক মেয়ের পিতা। বড় সাহেবজাদা মাওলানা মুফতি সাইয়্যিদ সালমান মানসুরপুরি হলেন শাহি মুরাদাবাদ মাদরাসার প্রধান মুফতি ও হাদিসের উস্তাদ। 'নেদায়ে শাহী' নামক সাময়িকীর সম্পাদক এবং একাধিক খণ্ডবিশিষ্ট এক ডজনেরও বেশি গ্রন্থের রচয়িতা।

ছোট সাহেবজাদা মাওলানা হাফেজ কারী সাইয়্যিদ আফফান মানসুরপুরি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ইফতা, আরবি সাহিত্য ও তাখাসসুস ফিল হাদিস বিভাগের শিক্ষা সমাপন করেন। শাহি মুরাদাবাদ মাদরাসায় চার বছর শিক্ষকতা করার পর বর্তমানে জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া জামে মসজিদ মাদরাসায় হাদিসের উস্তাদ ও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন।

ইন্তেকাল

২১ মে ২০২১ দুপুর দেড়টায় জুমার নামাজের সময় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ভারতের গুরগাঁও হাসপাতালের আইসিইউতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আল্লামা কারী সাইয়্যিদ মুহাম্মদ উসমান মানসুরপুরি রাহিমাহুল্লাহ। তাঁর ইন্তেকালে এশিয়া মহাদেশের দুই সুবিশাল দীনি প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দ ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। এমন মহামনীষা না ফেরার দেশে চলে যাওয়ায় সবাই শোকে স্তব্ধ। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কবরকে নুর দ্বারা ভরপুর করে দিন, আমিন।[৪৬]

---

৪৬. জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের উর্দু প্রেস রিলিজ থেকে অনুবাদ- মুফতি মুহাম্মদ আইয়ুব ও আব্দুর রহমান রাশেদ। টিকা, সংযোজন ও সম্পাদনা- অনুবাদক।

দারুল উলুম দেওবন্দের ইবনে হাজারখ্যাত মুহাদ্দিস,

বহুগ্রন্থ প্রণেতা, হযরত মাওলানা

হাবিবুর রহমান আজমি রাহিমাহুল্লাহ

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ও বুখারি শরিফের শ্রেষ্ঠ প্রবাদতুল্য ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজারের মেধার সঙ্গে তুলনা করে তাঁকে জামানার 'ইবনে হাজার' বলা হতো। তাঁর স্মরণশক্তি যেন উম্মাহ্‌র শুরুর প্রজন্মের কথা মনে করিয়ে দেয়। মাহনামায়ে দারুল উলুম 'আলকাসেম' এর সম্পাদক এবং ত্রিশেরও বেশি কিতাবের রচয়িতা। তিনি অত্যন্ত দক্ষ একজন কলম সৈনিক। হ্যাঁ, বলছিলাম হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি রাহিমাহুল্লাহুর কথা।

এই বিখ্যাত মুহাদ্দিস ভারতের উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলায় ১৩৬২ হিজরি মোতাবেক ১৯৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনের সূচনা

পাঁচ বছর বয়সেই তাঁর শিক্ষাজীবনের সূচনা হয়। নিজ এলাকারই বুজুর্গ হাজি মুহাম্মাদ শিবলি রাহিমাহুল্লাহুর কাছে শিক্ষাজীবন শুরু করেন। জামাতে পাঞ্জুম পূর্ণ করার পাশাপাশি ফার্সি ছোট-বড় বেশ কয়েকটি কিতাব পড়ে আজমগড়ের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান 'মাদরাতুল ইসলাম সারাইমজির' এ ভর্তি হন। এরপর বানারস মাদরাসা এবং দারুল উলুম মৌ মাদরাসায় জালালাইন-মেশকাত জামাত পর্যন্ত সম্পন্ন করেন।

নিজের ইলম পিপাসা নিবারনের জন্য ১৩৮২ হিজরিতে দারুল উলুম দেওবন্দ গমন করেন এবং সেখানে ইসলামি শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ও বিজ্ঞ ইলমি ব্যক্তিদের কাছে পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ১৩৮৩ হিজরি মোতাবেক ১৯৬৪ সালে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবন শুরু যেভাবে

প্রাতিষ্ঠানিক ইলম অর্জনের পর হযরত মাওলানা ফুলপুরি রাহিমাহুল্লাহুর নির্দেশে তাবলিগের খেদমত আঞ্জাম দেন। ১৯৬৫ সালে জামিয়া মাতলাউল উলুম বানারসের আহ্বানে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হন। সেখানে ইলমপিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে থাকেন। তাঁর ইলম সাধনা ও স্মৃতিশক্তির কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮০ সালের ১লা মে ফিদায়ে মিল্লাত ও আওলাদে রাসুল সায়্যিদ আসআদ মাদানি রাহিমাহুল্লাহুর আহ্বানে ফুজালাদের সম্মেলনে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে আসেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁকে মাসিক পত্রিকা 'আল কাসেম' এর সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

তিনি ১৯৮১ সালে দারুল উলুম দেওবন্দে মুদাররিস পদে যোগদান করেন। তাঁর অসামান্য প্রতিভার কারণে দারুল উলুমের মজলিসে শুরা শিক্ষকতার পাশাপাশি মাহনামায়ে দারুল উলুম সম্পাদনার দায়িত্বও তাঁর হাতে ন্যাস্ত করেন। তিনি সম্পাদনার সে মহান গুরুভার খুবই সুনামের সাথে আঞ্জাম দেন।

১৪১৪ হিজরিতে শাবান মাসে মজলিসে শুরা তাঁর অসামান্য যোগ্যতার মূল্যায়নস্বরূপ তাঁকে দাওরায়ে হাদিসের কিতাব পড়ানোর দায়িত্ব দেন। তখন থেকেই তিনি দরসে হাদিসের মসনদ অলংকৃত করে আসছেন। দরসের মসনদে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ছাত্রদের বিমুগ্ধ করে। তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ।

রচনাবলি ও বই-পুস্তক

লিখনির ময়দানেও রয়েছে তাঁর অসামান্য দক্ষতা। তাঁর কলম থেকে এ পর্যন্ত ৩০টির বেশি কিতাব লিপিবদ্ধ হয়েছে। যা তাঁর জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত ইসালে সওয়াব হিসেবে গণ্য হবে। তাঁর ইলমি পাণ্ডিত্যের সাক্ষর বহন করবে। বর্তমানে তাঁর কয়েকটি পুস্তিকা একত্রিত করে একটি কিতাব 'মাকালাতে হাবিবি' নামে প্রকাশ পেয়েছে।

দারুল উলুম দেওবন্দের আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান,
বহুগ্রন্থ প্রণেতা, হযরত মাওলানা

নুর আলম খলিল আমিনি রাহিমাহুল্লাহ

হযরত মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি, দারুল উলুম দেওবন্দের বিশিষ্ট উস্তাদ, আরবি-উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের একজন পণ্ডিত আলেম ছিলেন। এছাড়াও তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত আরবি ম্যাগাজিনের (আদ-দাঈ) সম্পাদক ছিলেন। আরবি ও উর্দু ভাষায় কয়েক ডজন বইয়ের লেখক 'আবু উসামা' মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি প্রায় ৭০ বছর বয়সে ২০ই রমজান ১৪৪২ হিজরি মোতাবেক ৩রা মে ২০২১ সোমবার, দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)।

তিনি প্রায় ৪০ বছর ধরে এশিয়ার বিখ্যাত ইসলামি বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষকতার মহান গুরুদায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। মৃত্যুর পর দারুল উলুম দেওবন্দেই তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। দারুল উলুম দেওবন্দেই মাকবারায়ে কাসিমিতে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাজার নামাজের ইমামতি করেন হযরত মাওলানা আরশাদ মাদানি।

আরবি ভাষা ও সাহিত্যে মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনির প্রতিভা কেবল উপমহাদেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ই নয়, আরব দেশগুলোর একাডেমিক অঙ্গনেও স্বীকৃত ছিল। তাঁর আরবি ভাষায় লিখিত বই এবং লেখাগুলো ছিল পাঠকের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁর মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ করা সহজ নয়। তবুও আল্লাহর কাছে আকুল আরজি– আল্লাহ পাক তাঁর শূন্যস্থানে দারুল উলুম দেওবন্দ এবং মুসলিম উম্মাহকে সর্বোত্তম বদলা দান করুন।

জন্ম ও পরিচিতি

মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি ১লা রবিউস সানি ১৩৭২ হিজরি মোতাবেক ১৮ই ডিসেম্বর ১৮৫২ মুজাফফরপুরে (বিহার) একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর যখন মাত্র তিন মাস তখনই বাবা মারা যান। এ সময় তাঁর মায়ের বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। তারপর তাঁর মায়ের অন্যত্র বিয়ে হলে সেই দ্বিতীয় পিতাও অল্প দিনেই মারা যান।

এভাবেই তাঁর সম্মানিতা মা দুইবার বিধবা হন। সেজন্য তাঁর প্রাথমিক দিনগুলো ছিল দরিদ্রতায় ভরপুর। তাঁর সহপাঠীদের থেকে শোনা, তিনি প্রায়ই বলতেন– আমার শোয়ার জন্য অনেক সময় একটা বালিশও ছিল না। তিনি একটি ইটে কাপড় বেঁধে তা বালিশ হিসেবে সবসময় ব্যবহার করতেন। তিনি তাঁর জন্মস্থান বিহারে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে প্রথমে মৌ তারপর দারুল উলুম দেওবন্দে এসে অবশিষ্ট স্তরের লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। সেই সময়, হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মিয়া দেওবন্দির পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লির মাদরাসা আমিনিয়ার প্রচুর খ্যাতি ছিল। তাই তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের পরে ১৯৭০ সালে মাদরাসায়ে আমিনিয়া থেকে পড়াশোনা শেষ করেন।

শিক্ষকমণ্ডলী

তিনি সর্বদা তাঁর রায়পুর মক্তব, মাদরাসা ইমদাদিয়া দরভাঙ্গা, দারুল উলুম মৌ, দারুল উলুম দেওবন্দ এবং মাদরাসায়ে আমিনিয়া দিল্লির সব শিক্ষককে বেশ কদর করতেন। তবে বিশেষত দুজন শিক্ষকের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি বিশ্বমানের আলেম হিসেবে গড়ে ওঠেছিলেন। তাদের একজন হলেন হযরত মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানভি রাহিমাহুল্লাহ এবং অন্যজন হলেন হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়া দেওবন্দি রাহিমাহুল্লাহ।

হযরত মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানভি রাহিমাহুল্লাহকে আল্লাহ তায়ালা অনেক বুদ্ধিমত্তা এবং অসংখ্য গুণ ও যোগ্যতা দিয়েছিলেন। সর্বদা ছাত্রদের নিজের চেয়ে আরও যোগ্য করে তোলার জন্য তাঁর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। হযরত মাওলানা ওয়াহিদুজজামান কিরানভি রাহিমাহুল্লাহর হাজার হাজার শিক্ষার্থী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছেন। আর এটিই তাঁর যোগ্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

কর্মজীবন যেভাবে শুরু

হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলি নদভির পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ১৯৭২ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত প্রায় দশ বছর নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌতে শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৮২ সাল থেকে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব পালন করেন। হাজার হাজার নয়, তার লাখ লাখ শিক্ষার্থী বিশ্বের পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্তে কুরআন ও হাদিসের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। অধম নিজেও দারুল উলুম দেওবন্দ পড়ার সময়ে একাধিকবার মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি সাহেবের দরসে বসার তাওফিক হয়েছে।

ইলমি খেদমত

প্রায় ৪০ বছর ধরে দারুল উলুম দেওবন্দের পাঠকনন্দিত আরবি ম্যাগাজিন রিসালাতে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এতে তিনি আরব ও আজমের কাছ থেকে বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন। এই আরবি ম্যাগাজিনের মাধ্যমেই তিনি আরব বিশ্বের কাছে দারুল উলুম দেওবন্দের পরিচয় ও স্বীকৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

জুলাই ২০১৩ সালে সৌদি সরকারের মেহমান হিসেবে দারুল উলুম দেওবন্দের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি দলে হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কাসিম নোমানি সাহেব ও হযরত মাওলানা আরশাদ মাদানি সাহেবের সঙ্গে মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি সাহেবও ছিলেন। তখন আরবদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে মুফতি আবুল কাসিম নোমানি সাহেব ও হযরত মাওলানা সায়্যিদ আরশাদ মাদানি সাহেব বেশ মুগ্ধ হয়েছিলেন। এছাড়াও সৌদি আরবের বিভিন্ন আরবি ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র ও পত্রিকাগুলোতে তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রায়ই প্রকাশিত হতো।

আরবি লেখালেখি ও বইপুস্তক

তাঁর বেশ কিছু বই আরবিতে প্রকাশ হয়েছে। 'মিফতাহুল আরাবিয়্যাহ' (দুই খণ্ড) এই বইটি উপমহাদেশের অনেক মাদরাসার দরসে নেজামির সিলেবাসভুক্ত। এছাড়াও তাঁর আরবি ভাষায় রচিত 'ফিলিস্তিন ফি ইনতেযারি সালাহুউদ্দিন', 'আল মুসলিমু ফিল হিন্দ', 'আস্‌সাহাবা ওয়া মাকানাতুহুম ফিল ইসলাম', 'মুজতামাআতুনাল মুআসারাহ ওয়াত-তারিকু ইলাল ইসলাম', 'আদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়া বাইনাল আমছি ওয়াল ইয়াউম'; 'মাতা তাকুনুল কিতাবাতু মুআছ্‌ছিরাতান'; 'তাআল্লামুল আরাবিয়্যাতা ফা ইন্নাহা মিন দিকুম' উল্লেখযোগ্য।

উর্দু লেখালেখি ও বইপুস্তক

আরবি বইয়ের পাশাপাশি তাঁর উর্দু বইও পাঠকের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর কয়েকটি উর্দু বইয়ের নাম হলো: 'ওয়াহ কুহ কিন কি কিতাব' (মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানভির জীবনী) 'ফিলিস্তিন কিসি সালাহুদ্দীন আইউবি কি ইনতেযার মে'; 'পস মরেগে জিন্দাহ' (এই বইটিতে ৩৮ জন সমসাময়িক পণ্ডিতের জীবন আলোকপাত উল্লেখ করা হয়েছে) এই বই থেকে অনুমান করা যায় উর্দু ভাষার শব্দচয়ন, বাক্যগঠন এবং ভাষার সার্বিক নিয়ম-কানুনের ওপর তাঁর পাণ্ডিত্য ও গভীরতা কেমন ছিল।

এছাড়াও উর্দু ভাষায় রচিত তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে– 'হরফে শেরেন'; 'মাওজুদা সালিবি আওর সাহ্‌নি জাঙ্গ'; 'সাহাবায়ে রাসুল ইসলাম কি নযর মে', 'কেয়া ইসলাম পিসপা হো রাহা হেঁ', 'খত্তে রুকআ কিউ আওর কেয়সে সিকহে?' এবং 'রাফতেগো না-রাফতাহ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর অনুবাদকর্ম

হযরত মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি রাহিমাহুল্লাহ উর্দু থেকে আরবিতে প্রায় ২৫টি বই অনুবাদ করেছেন। যার কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. 'আসরে হাজির মে দীন কি তাফহিম ওয়া তাশরিহ' (মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নদভি রাহিমাহুল্লাহ) 'আত-তাফসিরুস সিয়াসি লিল ইসলাম ফি মিরআতি কিতাবাতিল উসতায আবিল আলা মাওদুদি ওয়াশ শাহিদ সায়্যিদ কুতুব'।

২. 'পাকিস্তানিউ সে সাফ সাফ বাতে' (মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নদভি রাহিমাহুল্লাহ) 'আহাদিসুন সারিহাতুন ফি পাকিস্তান'।

৩. 'মাওলানা ইলিয়াস আওর উনকি দীনি দাওয়াত' (মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রাহিমাহুল্লাহ) 'আদ-দাঈ আল কাবির আশ-শায়েখ মুহাম্মদ ইলিয়াস'

৪. 'হযরত আমিরে মুয়াবিয়া আও তারিখি হাকায়েক' (মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি) 'সায়্যিদুনা হযরত মুয়াবিয়া রাযিআল্লাহু আনহু ফি যাওয়িল ওয়াসায়িকিল ইসলামিয়া'।

৫. 'উলামায়ে দেওবন্দ কা দীনি রুখ আওর মাসলাকি মেজাজ' (হাকিমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তাইয়্যিব রাহিমাহুল্লাহ) 'উলামাউ দেওবন্দ ওয়াত-তিহাজিহুমুদ-দীনি ওয়া মিযাজুহুমুল মাজহাবি'।

৬. 'মিনাজ জুলুমাতি ইলান-নুর' (কৃষ্ণ লাল)

৭. 'হিন্দুস্তান কি তালিমি হালাত ইংরেজি সামিরাজ সে পাহলে আওর উসকি আমাদ আমাদ কে বাদ' (মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানি রাহিমাহুল্লাহ) 'আল হালাতুত-তালিমিয়্যাতু ফিল হিন্দি ফিমা কাবলা আ'হদিল ইসতি'মারিল ইনজেলেযি ওয়া ফিমা বাদাহু'।

৮. 'ইরানি ইনকিলাব ইমাম খামিনি আওর শিইয়্যাত' (মাওলানা মনযূর আহমাদ নোমানি রাহিমাহুল্লাহ) 'আছ-ছাওরাতুল ইসলামিয়্যাহ ফি যাওয়িল ইসলাম'।

৯. 'দাওয়াতে ইসলামি; মাসায়েল ওয়া মাশকিলাত' (মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহি) 'আদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়া কাজায়া ওয়া মশকিলাতুন'।

১০. 'ইশতেরাকিয়্যাত আওর ইসলাম' (ডা. খুরশিদ আহমদ) 'আল-ইশতেরাকিয়্যাহ ওয়াল ইসলাম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও মাওলানা সাঈদুর রহমান নদভি রাহিমাহুল্লাহ এবং মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহিমাহুল্লাহুর অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ আরবিতে অনুবাদ করেছেন।

সম্মাননা ও পুরস্কার

হযরত মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি আরবি ভাষায় নিঃস্বার্থ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৭ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক (Presidential Certificate of Honour) রাষ্ট্রপতি সম্মানে সম্মানিত হন।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি লিখিত; 'ফিলিস্তিন ফি ইনতেযারি সালাহুদ্দিন' বইটি আর্থ-রাজনৈতিক দিক নিয়ে বিশেষ প্রসঙ্গে একটি ডক্টরাল প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছিল।

মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনির আরবি বই ও লেখাগুলো আরব এবং আজম পাঠকদের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে তাঁর উর্দু গ্রন্থগুলোও সর্বশ্রেণির পাঠকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যায়িত হয়।

এজন্য নির্দ্বিধায় বলা যায়, আরবি ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি উর্দু ভাষা ও সাহিত্যেও তাঁর দখল ছিল অসাধারণ।

দারুল উলুম দেওবন্দের নায়েবে মুহতামিম ও প্রখ্যাত
হাদিস বিশারদ, হযরত মাওলানা

আবদুল খালেক সাম্ভলি রাহিমাহুল্লাহ

মাওলানা আব্দুল খালেক সাম্ভলি রাহিমাহুল্লাহ। দারুল উলুম দেওবন্দের নায়েবে মুহতামিম ও হাদিস বিশারদ। তাঁর কাছ থেকে সিহাহ সিত্তার অন্যতম কিতাব 'সহিহ ইবনে মাজাহ'র দরস ও ইজাজত লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল অধমের। সহজ-সরল ভাষায় হাদিসের ব্যাখ্যা, প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ উপস্থাপন, রসাত্মক কাহিনির মাধ্যমে দরসগাহকে আনন্দমুখর করা এবং উর্দু ও ফার্সি কবিতার মাধ্যমে বক্তব্যকে শ্রুতিমধুর করে তোলা, সর্বোপরি আকাবিরের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে জটিল বিষয়কে সহজলভ্য করে তোলার ক্ষেত্রে অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন মাওলানা আব্দুল খালেক সাম্ভলি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি যেমন ছিলেন একজন দক্ষ শিক্ষক, তেমনি ছিলেন একজন বিদ্বান ও সুলেখক। তাঁর বক্তব্য যেমন ছিল শ্রুতিমধুর, তেমনি তাঁর লিখনি ছিল অনেক ক্ষুরধার। ফতওয়ায়ে আলমগীরির কিছু খণ্ড তিনি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেছেন, যা প্রত্যেক পাঠককেই মুগ্ধ করেছে। এছাড়াও তিনি মুখতাসারুল মাআনিসহ দরসে নেজামির অনেক জটিল কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থও রচনা করেছেন।

জন্ম ও জন্মস্থান

মাওলানা আব্দুল খালেক সাম্ভলি রাহিমাহুল্লাহ ভারতের উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদ জেলার 'সাম্ভল' এলাকায় ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৫০ সালে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মলাভ করেন। তাঁর পিতার নাম নাসীর আহমদ। তাঁর পিতা একজন নম্র-ভদ্র, সরল-কোমল হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। একজন পল্লিকবি হিসেবেও তার সুখ্যাতি ছিল।

শিক্ষা-দীক্ষা ও উস্তাদ

মাওলানা আব্দুল খালেক সাম্ভলি রাহিমাহুল্লাহ প্রাথমিক পড়াশোনা নিজ গ্রামের প্রতিষ্ঠান 'খায়রুল মাদারিস'-এ শুরু করেন। এরপর তিনি শামসুল উলুম মাদরাসায় হাফেজ ফরিদুদ্দিন সাহেবের কাছে হিফজ সমাপ্ত করেন এবং ফার্সি ও প্রাথমিক আরবি জামাত থেকে নিয়ে 'শরহে জামি' পর্যন্ত মুফতি মুহাম্মদ আফতাব রাহিমাহুল্লাহুর কাছেই পড়েন। ১৯৬৮ সালে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। প্রায় পাঁচ বছর সেখানে পড়াশোনা করেন। এখানে পড়াশোনাকালে তিনি তার সময়গুলো একাডেমিক পড়াশোনায় ব্যয় করেন। নিয়মিত দরসে উপস্থিত থাকা, পড়ালেখায় মনোনিবেশ করা, শিক্ষকমণ্ডলী ও ইলমের সরঞ্জামগুলোর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সুশৃঙ্খলভাবে কাজ সম্পাদন করা ইত্যাদি ছিল তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১৯৭২ সালে দাওরায়ে হাদিস সমাপনী পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি আরবি সাহিত্যে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে দারুল উলুম দেওবন্দে 'তাকমিলে আদব'-এ ভর্তি হন। সেখানে মাওলানা ওয়াহিজদুজ্জামান কিরানভি রাহিমাহুল্লাহুর বিশেষ সান্নিধ্যে থেকে আরবি সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। দারুল উলুম দেওবন্দের শীর্ষ শায়খদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। শায়খুল হিন্দ রাহিমাহুল্লাহুর প্রসিদ্ধ শিষ্য আল্লামা ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদি রাহিমাহুল্লাহুর কাছ থেকে তিনি সহিহ বুখারি শরিফ পড়েন। হাকিমুল ইসলাম আল্লামা কারি তৈয়ব রাহিমাহুল্লাহ, মুফতি মাহমুদুল হাসান রাহিমাহুল্লাহ, আল্লামা শরিফুল হাসান রাহিমাহুল্লাহ এবং আল্লামা নাসির আহমাদ খান রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখের কাছ থেকেও তিনি হাদিসের সনদ অর্জন করেন।

কর্মজীবন

১৯৭৩ সাল থেকে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। তিনি সর্বপ্রথম হাপুড়ের খাদেমুল ইসলাম মাদরাসায় সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে ছয় বছর পর্যন্ত সুনামের সাথে অধ্যাপনার কাজ চালিয়ে যান। এরপর ১৯৭৯ সালে মুরাদাবাদের জামিউল হুদা মাদরাসায় সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে তিন বছর জ্ঞান বিতরণ করেন। ১৯৮২ সালে দারুল উলুম

দেওবন্দে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৯৮২ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ৩৯ বছর তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের খাদেম ছিলেন। এখানকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। তিনি ছিলেন আমানতদারি ও সততার মূর্তপ্রতীক। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ছিলেন। শেষ সময়ে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের সহকারী পরিচালকের গুরুদায়িত্বও পালন করেন।

মৃত্যু ও কাফন-দাফন

৩০শে জুলাই ২০২১ মোতাবেক ২০শে জিলহজ ১৪৪২ হিজরি জুমাবার তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) রাত ১১টায় দারুল উলুম দেওবন্দের ঐতিহাসিক 'মুলসুরি ময়দানে' তাঁর নামাজে জানাজা শেষে 'মাকবারায়ে কাসেমি'তে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁর কবরকে রিয়াজুল জান্নাহয় পরিণত করুন, আমিন।[৪৭]

সমাপ্ত

৪৭. উর্দু নিউজপোর্টাল আওয়াজ দ্য ভয়েস থেকে অনূদিত